ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

চতুর্থ বর্ষ ● সংখ্যা : ১০
জানুয়ারি-মার্চ-২০২০

ভাষা আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রাম অতঃপর আমরা

করোনা ভাইরাস : আল্লাহর গজব থেকে বাঁচার উপায়

আদর্শ শ্রমনীতি বাস্তবায়নের কৌশল ও পদ্ধতি

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস

শ্রমিক আন্দোলনে পেশাভিত্তিক নেতৃত্ব অপরিহার্য

গ্রানাডা ট্র্যাজেডি মুসলিম উম্মাহর রক্তাক্ত ইতিহাস আমাদের সতর্কতা

বিভাগ ও মহানগরী সভাপতিদের বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা ডাক্তার শফিকুর রহমান

ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা ডাক্তার শফিকুর রহমানের কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন বিভাগ ও মহানগরী পর্যায়ে ২০১৯ সালে ট্রেড ইউনিয়ন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ১ম স্থান আধিকারি রাজশাহী বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি আব্দুস সবুর।

চট্টগ্রাম মহানগরীর সদস্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি আ.ন.ম শামসুল ইসলাম

ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে ফেডারেশনের উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুস সোবহানের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া পরিচালনা করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি আ.ন.ম শামসুল ইসলাম

চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের উপজেলা সভাপতি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উপদেষ্টা ড.শফিকুল ইসলাম মাসুদ

সিলেট বিভাগের ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

চতুর্থ বর্ষ ● সংখ্যা ১০

জানুয়ারি-মার্চ- ২০২০

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম

সম্পাদক
আতিকুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী
নুরুল আমিন
আজহারুল ইসলাম
আবুল হাসেম

সার্কুলেশন
আশরাফুল আলম ইকবাল

কম্পিউটার কম্পোজ
আঙ্গুর মিয়া (সালমান)

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
আবু তাশরিন

প্রকাশকাল
মার্চ-২০২০

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা

সূচিপত্র

করোনা ভাইরাস : আল্লাহর গজব থেকে বাঁচার উপায় ৩
আব্দুস সালাম

ভাষা আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রাম অতঃপর আমরা ৫
ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

গ্রানাডা ট্র্যাজেডি মুসলিম উম্মাহর রক্তাক্ত ইতিহাস আমাদের সতর্কতা ১০
অ্যাডভোকেট আবু তাহের

আদর্শ শ্রমনীতি বাস্তবায়নের কৌশল ও পদ্ধতি ১৫
লস্কর মোহাম্মদ তসলিম

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ১৯
আতিকুর রহমান

জামায়াতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব ২৬
ড. সৈয়দ এ.কে.এম. সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী

ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা চর্চা ও ভাষা আন্দোলনে শ্রমিকদের অবদান ৩০
ড. মোঃ জিয়াউল হক

শ্রমিক আন্দোলনে পেশাভিত্তিক নেতৃত্ব অপরিহার্য ৩৫
এস এম লুৎফর রহমান

ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার ৩৬
ফখরুল ইসলাম খান

ছক্কা ছয়ফুরের বাবুর্চি থেকে প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন ৩৯
অ্যাডভোকেট ইয়াসীন খান

আজব দেশ! ৪১

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ৪২
এস এ মওদূদী

একুশেরগল্প বসিরণ ৪৪
মোঃ আসাদ হোসেন

আত্মোপলব্ধির দর্শন ৪৫
মুহাম্মদ আসাদ উল্লাহ আদিল

পেশা পরিচিতি ৪৬

স্বাস্থ্য কথা:অতিরিক্ত গরমে করণীয় ও বর্জনীয় ৪৮

আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো ও নির্মাতাদের কাছে আমরা কী চাই? ৪৯
মমিন উল্লাহ পাটওয়ারী

ফেডারেশন সংবাদ ৫০

সম্পাদকীয়

'পলাশ ফুলে শিমুল ফুলে স্বপ্ন ফুলে আগুন
ভাষার মিছিল আশার মিছিল
দেয় জাগিয়ে রক্তঝরা টগবগে লাল ফাগুন।'

ফাল্গুনের এ মিষ্টি রোদেই শানিত হয়েছিল অধিকার আদায়ের সংঘবদ্ধ শ্লোগান। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একগুয়েমি আচারণের সমুচিত জবাব দিতেই রাজপথ শিমুল-পলাশের রঙ্গে রঞ্জিত করেছে, ঢেলে দিয়েছে বুকের তাজা খুন। শহীদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অসংখ্য জীবন্ত শহীদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আমাদের স্বকীয়তা ফিরে পেতে সক্ষম হয়েছিলাম। এ ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের বিজয়, আমাদের প্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশ। ইতিহাস সাক্ষী ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন, ৫২ এর ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সব একই সূত্রে গাঁথা। একটি ছাড়া অন্যটি হতে পারতনা।

ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হবার ৪৯ বছর আমরা পার করেছি। মহাকালের বিচারে ৪৯ বছর খুব ছোট সময় নয়। এই অল্প সময়ের ব্যবধানে অনেক জাতির এগিয়ে যাবার নজীর আছে। এই বছর আমরা স্বাধীনতার ৫০ তম বছরে পদার্পণ করেছি। এ বড় আনন্দঘন অনুভূতি। তবে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস যেমন গৌরবের, তেমনি বেদনারও। রক্ত ও বহু আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা আজ পরাধীনতার গ্রাসে। শকুনের চোখ পড়েছে দেশের উপর। আজ স্বাধীন দেশে বাস করে মনে হয় পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ আমরা। দেশে গনতন্ত্র নেই, আইনের শাসন নেই, কথাবলার স্বাধীনতা নেই, দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার শৃঙ্খলা নেই, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নেই, জীবনের নিরাপত্তা নেই। আছে কি? আছে বিনা বিচারে হত্যা, গুম, খুন, দুর্নীতি, ঘুষ ও বিচারের নামে অবিচার। আজ সারা দেশে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের আওয়াজ উঠেছে, আমরা কি এই জন্য দেশ স্বাধীন করেছিলাম, এই জন্য কি এত আত্মত্যাগ করেছিলাম। দেশের সকল জনগণ ব্যক্তি, দল, সংকীর্ণ রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর উঠে দেশের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আজ শুধু একটি রাজনৈতিক দল অর্জিত স্বাধীনতার সুফল ভোগ করছে! এ দেশ স্বাধীন করতে ভূমিকা পালন করেছে শ্রমিক, কৃষক, তরুণ, যুবক, শিক্ষকসহ সকল শ্রেনী পেশার মানুষ। এই দেশ স্বাধীন করতে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের অবদান কম নয়। ৪৭ থেকে ৫২, ৭১ থেকে ৯০ যত আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। শুধু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনেই নয়, দুনিয়ায় যত আন্দোলন হয়েছে সব সংগ্রামে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা ছিল।

শ্রমিকেরা শুধু সভ্যতাই নির্মান করেনি, সভ্যতা বির্নিমাণের সংগ্রামে যোগদান করে পৃথিবীতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সারা দুনিয়ায় শতশত আন্দোলন, হাজার হাজার আইন-বিধি ও নিয়ম করে শ্রমিকরা তাদের অধিকার ও মর্যাদা পায়নি। শ্রমিকদের কান্না আর আহাজারিতে আজ আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। কোথাও আজ শান্তি ও মানবতা নেই। শান্তি ও মানবতাবাদী শাশ্বত বিধান একমাত্র পাওয়া যাবে ইসলামী শ্রমনীতিতে। আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই শ্রমিকের অধিকার ও শ্রম আইনের পথ প্রদর্শক, পৃথিবীর সফল শ্রমিক নেতা,মানবতার প্রকৃত বন্ধু ও মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার বিদায় হজ্বের ভাষনে বলেছেন,' হে জনমন্ডলী! শুনে রাখো, মুসলিম পরস্পর ভাই-ভাই, তোমাদের অধীন ব্যক্তিগন তোমাদের ভাই! তোমরা নিজেরা যা খাবে,তা-ই তাদেরকে খাওয়াবে, নিজেরা যা পরবেন, তা-ই তাদেরকে পরতে দিবে।

কিন্তু অধিকাংশ মালিক নবীর এই হুকুম মেনে নিতে চায়না। মালিক পক্ষ বেশী মুনাফা অর্জনকেই জীবনের মুল লক্ষ্য বানানোর কারণে শ্রমিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। শ্রমিকরা তাদের জীবন বাঁচাতে গিয়ে বাধ্য হয় শ্রম দিতে। তাদের এই অসহায়ত্বকে শোষণের সুযোগ মনে করে মালিক পক্ষ বেশী মুনাফা অর্জন করতে চায় এবং তারাই সমস্যার সৃষ্টি করে। চলমান অর্থ শিল্প শ্রমনীতিতে ইনসাফপূর্ণ ভারসাম্যমুলক বন্টন ব্যবস্থা নেই। মানব রচিত আইন ইনসাফপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারেনা। আর একমাত্র ইসলামী শ্রমনীতিই কল্যাণমুলক ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা।

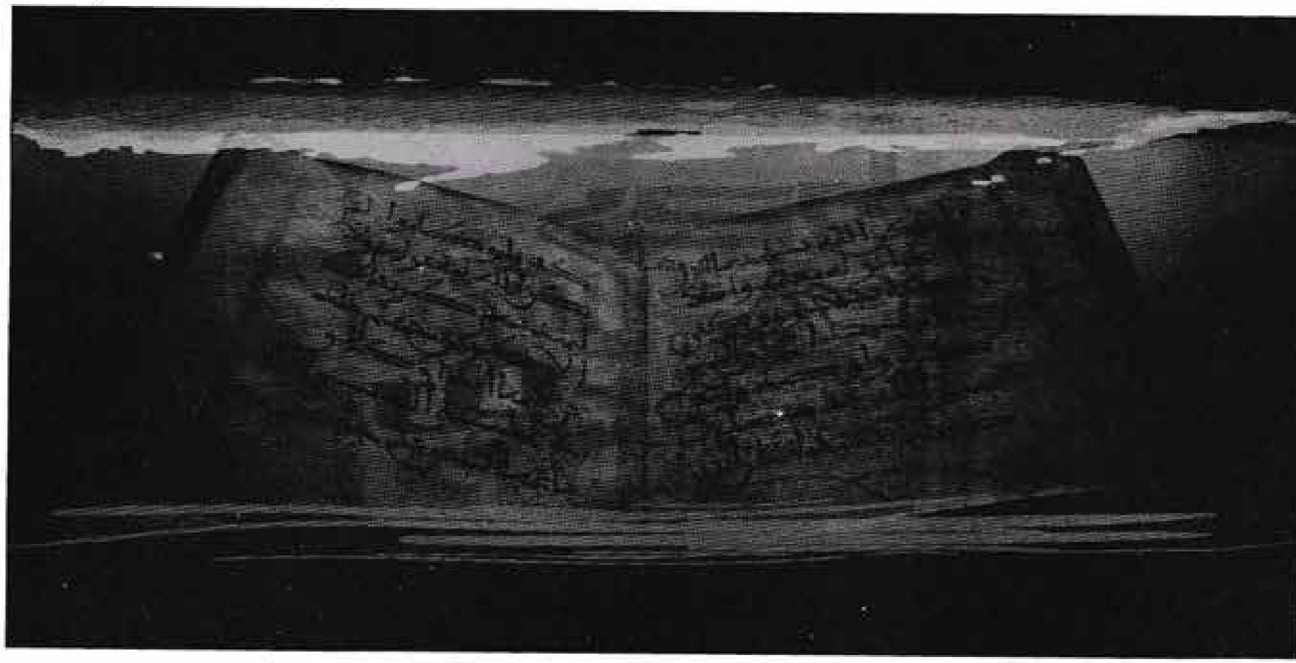

করোনা ভাইরাস : আল্লাহর গজব থেকে বাঁচার উপায়

আব্দুস সালাম

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

সরল অনুবাদঃ জলে ও স্থলে মানুষের কৃতকর্মের দরুণ বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। (সূরা আর রূম-৪১)

নামকরণঃ প্রথম আয়াতের 'গুলিবাতির রূম' থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাজিলের সময়কালঃ শুরুতেই যে ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে তা থেকে নাযিলের সময়-কাল চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। এখানে বলা হয়েছে যে, "নিকটবর্তী দেশে রোমীয়রা পরাজিত হয়েছে।" সে সময় আরবের সন্নিহিত রোম অধিকৃত এলাকা ছিল জর্দান, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন। এসব এলাকায় রোমানদের ওপর ইরানীদের বিজয় ৬১৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ণতা লাভ করেছিল। এ থেকে পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে যে, এ সূরাটি সে বছরই নাযিল হয় এবং হাবশায় হিজরত এ বছরই অনুষ্ঠিত হয়।

আয়াতের ব্যাখ্যাঃ জলে ও স্থলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের কুকর্মের বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। বিপর্যয় বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকান্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলীর প্রাদুর্ভাব, সব কিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ-বিপদ বোঝানো হয়েছে। (সা'দী, কুরতুবী, বাগভী) অন্য এক আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে, "তোমাদেরকে যেসব বিপাদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণে। অনেক গোনাহ তো আল্লাহ ক্ষমাই করে দেন।" (সূরা আশ-শুরা: ৩০) 'স্থল' বলতে মানুষের বাসভূমি এবং জল বলতে সমুদ্র, সামুদ্রিক পথ এবং সমুদ্র-উপকূলে বসবাসের স্থান বুঝানো হয়েছে। 'ফাসাদ' (বিপর্যয়) বলতে ঐ সকল আপদ-বিপদকে বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা মনুষ্য-সমাজে সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট হয় এবং মানুষের শান্তিময় জীবন-যাত্রা ব্যাহত হয়। এই জন্য এর অর্থ গুনাহ ও পাপাচরণ করাও সঠিক। অর্থাৎ, মানুষ একে অপরের উপর অত্যাচার করছে, আল্লাহর সীমা লংঘন করছে এবং নৈতিকতার বিনাশ সাধন করছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত সাধারণ ব্যাপার হয়ে পড়েছে। অবশ্য 'ফাসাদ'-এর অর্থ আকাশ-পৃথিবীর ঐ সকল বিপর্যয় নেওয়াও সঠিক, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি ও সতর্কতা স্বরূপ প্রেরণ করা হয়। যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনিরাপত্তা, ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে, যখন মানুষ আল্লাহর অবাধ্যতাকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে নেয়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিফল স্বরূপ তাদের কর্মপ্রবণতা মন্দের দিকে ফিরে যায় এবং তার ফলে পৃথিবী নানা বিপর্যয়ে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, সুখ-শান্তি বিলীন হয় এবং তার পরিবর্তে ভয়-ভীতি, নিরাপত্তাহীনতা, ছিনতাই-ডাকাতি, লড়াই ও লুটপাট ছড়িয়ে পড়ে। তার সাথে সাথে কখনো আকাশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন আপদ-বিপদ (প্রাকৃতিক দুর্যোগ)ও প্রেরিত হয়। আর তাতে উদ্দেশ্য এই থাকে যে, ঐ সর্বনাশী বিপর্যয় ও আপদ-বিপদ দেখে সম্ভবত মানুষ পাপকর্ম থেকে বিরত হবে এবং আল্লাহর কাছে তওবা করে পুনরায় তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসবে। এর বিপরীত যে সমাজের রীতি-নীতি ও চাল-চলন আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যে সমাজে আল্লাহর 'হদ্দ' (দন্ডবিধি)

কায়েম হয়, অত্যাচারের জায়গায় ন্যায়পরায়ণতা বিরাজ করে, সে সমাজে সুখ-শান্তি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে মঙ্গল ও বরকত দেওয়া হয়। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার একটি 'হদ্দ' কায়েম করা সেখানকার মানুষের জন্য চল্লিশ দিনের বৃষ্টি থেকেও উত্তম।" (নাসাঈ, ইবনে মাজা) অনুরূপ একটি হাদীসে এসেছে, "যখন একটি পাপাচারী মারা যায়, তখন শুধু মানুষই নয়; বরং গ্রাম-শহর, গাছপালা এবং প্রাণীরাও পর্যন্ত শান্তিলাভ করে।" (বুখারীঃ কিতাবুর রিক্বাক, মুসলিমঃ কিতাবুল জানাইয)। গোটা দুনিয়ায় আজ এক আতঙ্ক বিরাজ করছে। ঘরে বাইরে সর্বত্র মানুষকে আঙ্ক তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ভয়, আতঙ্ক, দ্বিধা আর সন্দেহের দোলাচলে মানুষের জীবন এক দুর্বিসহ বিপাকে ঘুরপাক খাচ্ছে। (Covid-১৯) করোনা ভাইরাস চীনের উহান প্রদেশ থেকে উৎপত্তি হয়ে এখন দু'শতাধিক দেশে সংক্রমিত হয়েছে। এ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তার মানবীয় চিন্তা, প্রযুক্তি এবং বস্তুগত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তা মোকাবেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু আল্লাহ যখন কোনো জাতির জন্য গজবের ফায়সালা করেন তখন তা মোকাবেলা করা যায় না। মহান আল্লাহ বলেন-

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَ الْجَرَادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفَادِعَ وَ الدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ.

সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, ব্যাঙ ও রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরেও তারা গর্ব করতে থাকল। বস্তুতঃ তারা ছিল অপরাধপ্রবণ। (সূরা আরাফ-১৩৩)
উক্ত আয়াতটি ফেরাউনের যাদুকরেরা মূসা (আঃ) এর নিকট পরাজিত হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে নাজিল হয়। কথা ছিল ফেরাউনের বাহিনী পরাজিত হলে তারা আল্লাহর উপর ঈমান আনবেন। কিন্তু কথা রাখেননি, ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে উপরোক্ত গজবগুলো ফেরাউনের কিবতি বংশধরের উপর এসেছিল।
আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন-

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ব্যতীত কোনো বিপদ আসেনা, আর যে আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ তাআলা সব বিষয়ে জানেন। (সূরা তাগাবুন-১১)
মুমিনদের জন্য সকল বিপদ আপদ তার নিকট পরীক্ষা স্বরূপ, যেমন আল্লাহ বলেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

অর্থ: অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের, যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। (সূরা বাক্বারা ১৫৫-১৫৬)
করোনা ভাইরাস একটি অতিক্ষুদ্র জীবাণু, যা খালি চোখে দেখা যায়না এমনকি শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা যায়না। এমন একটি জীবাণু দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাজিল করে, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা-ফাতহ্-০৪) আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর বাহিনী। যখন যাকে আল্লাহ হুকুম করেন তখন তা আল্লাহর পক্ষ হয়ে ভূমিকা পালন করেন। আল্লাহর বাহিনী দ্বারা আল্লাহ অনেক সময় মুমিনদেরকে সাহায্য করেন এবং কাফেরদেরকে নাস্তানাবুদ করে দেন। আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্বরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। (সূরা আহযাব-০৯)। খন্দকের যুদ্ধের শেষ দিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঝঞ্ঝাবায়ু ও অদৃশ্য বাহিনী দ্বারা কাফেরদেরকে তছনছ করে দিয়েছিলেন। আজ গোটা পৃথিবীতে মুসলমানদের উপর যে যুলুম, অত্যাচার এবং নির্যাতন চলছে তা থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য এবং কাফেরদেরকে শায়েস্তা করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এই অদৃশ্য করোনা ভাইরাস বাহিনীকে প্রেরণ করে থাকতে পারেন। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ছোয়াচে কোন রোগ নেই (বুখারী ও মুসলিম)
আমরা সকল সময় পাক পবিত্র অবস্থায় চলব কিন্তু বিশ্বাস রাখবো রাসূল (সাঃ) এর কথার উপরে এবং রাসূল (সাঃ) বলেছেন-কেউ যদি সকালে খালি পেটে সাতটি আজোয়া খেজুর ভক্ষন করে তবে সেই ব্যক্তি ঐদিন সকল বিষক্রীয়া থেকে রক্ষা পাবে। (তিরমিযি)
রাসূল (সাঃ) বলেছেন-জমজমের পানিতে শেফা রয়েছে। এই বিশ্বাসের আলোকে যেকোন অসুস্থ মানুষকে জমজমের পানির মাধ্যমে রোগমুক্তির চেষ্টা করা যেতে পারে এবং রাসূল (সাঃ) এর শিখানো দোয়ার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে রোগমুক্তি কামনা করতে পারি। রাসূল সাঃ দোয়া শিখিয়েছেন, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল বারসি, ওয়াল জুনুনি, ওয়াল জুযামি, ওয়া মিন ছাইয়্যি ইল আসক্বাম। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)। অর্থঃ হে আল্লাহ অবশ্যই আমি তোমার নিকট ধবল, উম্মাদ, কুষ্ঠরোগ এবং সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
সর্বোপরি কথা হলো- আমরা আল্লাহর কাছে সর্বাবস্থায় ইস্তেগফার করতে থাকবো এবং সকল মানুষদেরকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে এবং রাসূল (সাঃ) এর আদর্শের অনুসরণের দিকে আহ্বান করতে থাকবো। তারপরেও যদি কোন ঈমানদার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তাহলে আমরা রাসূল (সাঃ) এর কথা অনুযায়ী বিশ্বাস রাখবো রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কোন ঈমানদার মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে সেই ব্যক্তির শহীদি মৃত্যু হয়। অন্যদিকে কাফেরদের মৃত্যুর ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, নিশ্চই যারা কুফুরী করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহর ফেরেস্তাগণের এবং সমগ্র মানুষের লানত। এরা চিরকাল এ লানতের মাঝেই থাকবে। তাদের উপর থেকে আযাব কখনও হালকা করা হবে না বরং এরা বিরামও পাবেনা। (সূরা বাক্বারা ১৬২-১৬৩)

শিক্ষা:

(১) আল্লাহ তালার নিকট সর্বাবস্থায় ইস্তেগফার করা এবং সকল প্রকার গজব হতে মাবুদের নিকট পানাহ চাওয়া।
(২) রাসূল সাঃ এর সুন্নত অনুযায়ী সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং পরিবারকে সচেতন করা।
(৩) রাসূল সাঃ এর শিখিয়ে দেওয়া দোয়া করা।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

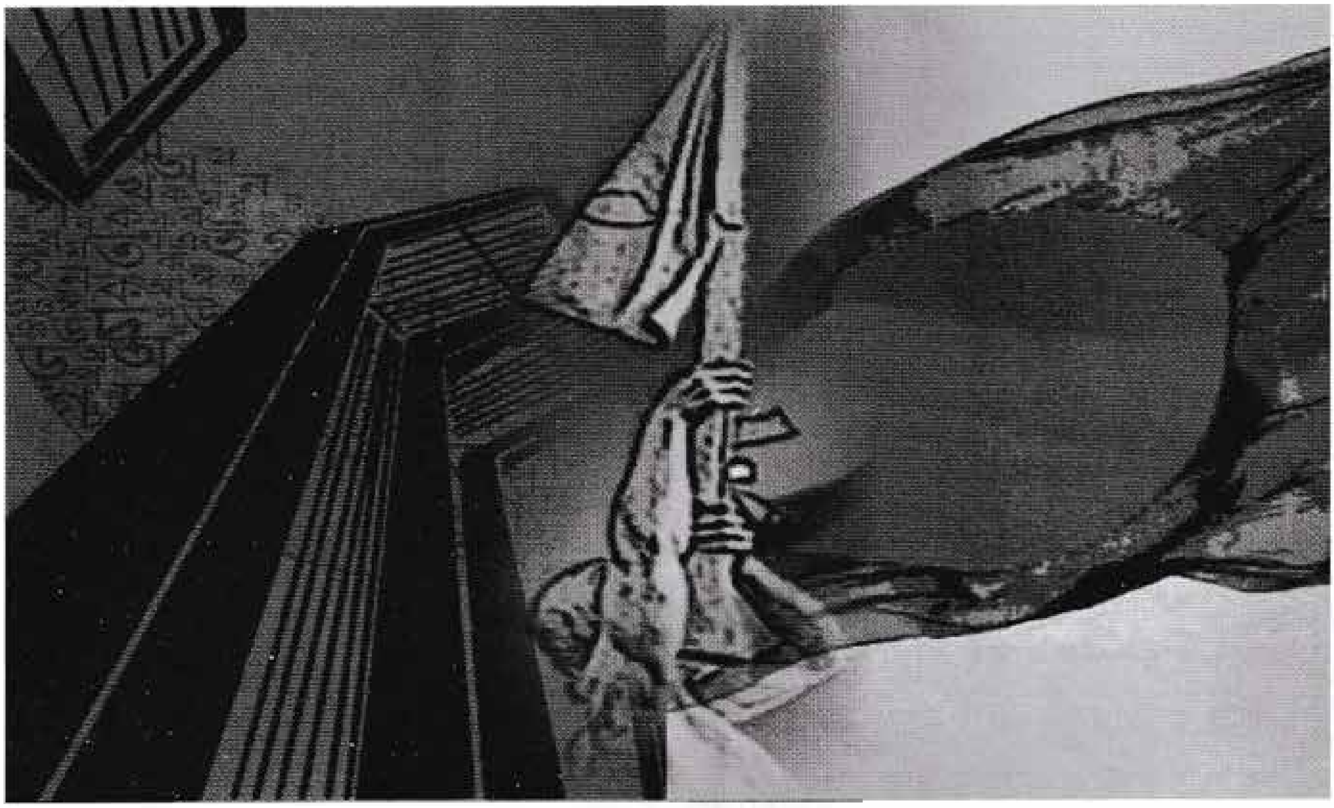

ভাষা আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রাম অতঃপর আমরা

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

'পলাশ ফুলে শিমুল ফুলে স্বপ্ন ফুলে আগুন
ভাষার মিছিল আশার মিছিল
দেয় জাগিয়ে রক্তঝরা টগবগে লাল ফাগুন।'

ফাগুনের এ মিছিরোদেই শাণিত হয়েছিল অধিকার আদায়ের সংঘবদ্ধ শ্লোগান। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একগুঁয়েমি আচরণের সমুচিত জবাব দিতেই রাজপথ শিমুল-পলাশের রঙে রঞ্জিত করেছে, ঢেলে দিয়েছে বুকের তাজা খুন। শহীদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অসংখ্য জীবন্ত শহীদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আমাদের স্বকীয়তা ফিরে পেতে সক্ষম হয়েছিলাম। এ ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের বিজয়, আমাদের প্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশ। এ স্বাধীন দেশেই স্বপ্ন আঁকি। মেহনত করেই স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাই।

ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম

জন্মগতভাবে মায়ের কোল থেকে যে ভাষা শেখা হয় তার মায়াই আলাদা। একান্ত আপনজনকে 'মা' বলে সম্বোধন করার সুযোগ এ ভাষা থেকেই পেয়েছি। এ ভাষার লালনে সুলতানি ও মোগল আমলের মুসলিম শাসকদেরও রয়েছে অনন্য পৃষ্ঠপোষকতার গৌরব। কোন দুষ্টচক্রের কথায় আমরা আমাদের এ ঐতিহ্যকে হারাতে দিতে পারি না। তাইতো আমাদের ফুঁসে ওঠা, আমাদের আন্দোলন, আমাদের রক্তঢালার প্রতিযোগিতা। উনিশ শ' বায়ান্ন সালে আমরা বিজয়ী হয়েছি। তখনও প্রমাণিত হয়েছে, জোর করে কোন মতকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া যায় না। বাংলাদেশের স্বাধীনচেতা মানুষ স্বকীয় আদর্শ নিয়েই বেঁচে থাকতে পছন্দ করে এবং তা করেই ছাড়ে।

বায়ান্ন থেকে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের যে অধিকার আমরা আদায় করেছি, নিজের ভাষাচর্চার যে স্বাধীনতা পেয়েছি সে পথ ধরেই এগিয়ে

যেতে চাই আজীবন। ধাপে ধাপে সমৃদ্ধ করতে চাই আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষাকে। কিন্তু আগ্রাসী হায়েনারা আমাদের এ পথচলা কখনো মসৃণ হতে দেয়নি। বিদেশী ভাষাগুলো নানা কৌশলে আমাদের উপর চেপে বসেছে। ইংরেজি এখন দুনিয়ার চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জকে জয় করতেই হবে, তবে আমার মাতৃভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে নয়। কেউ কেউ আরবি ভাষাকেও বাংলা ভাষার জন্যে চ্যালেঞ্জ হিসেবে ছুঁড়ে দিয়ে এক্ষেত্রে ইসলাম চর্চাকে দোষারোপ করে থাকেন। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, ইসলামকে জানা শোনার জন্য আরবি ভাষাচর্চা প্রয়োজন হলেও বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞানচর্চার যে সুযোগ আছে সেটাকে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে পারলে বাংলা ভাষা বরং অনেকাংশে উৎকর্ষতার শীর্ষে পৌঁছতে সহায়ক হবে বৈকি। ইসলামের নানামুখী গবেষণা বাংলা ভাষায় হলে ভাষার সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি অনেক সহজ হবে। তবে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের নামে হিন্দি সংস্কৃতির মাধ্যমে যে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক থাবা আমাদের উপর পড়েছে তা উদ্ধারের কোন বিকল্প নেই। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এ থাবায় পঙ্গু হয়েছে বলা যায়। সেখানকার শিশুরা এখন আর বাংলা ভাষা বলতেই পারে না বলা চলে। মুদি দোকানদারেরা পর্যন্ত সে জালেই বন্দি। হয়তো হিন্দি নতুবা ইংরেজি। বাংলা ভাষার জন্য এখন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করতে পারে একমাত্র বাংলাদেশই। তাই আগামীতে বাংলাদেশকেই বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে শুধু নয় বাংলা ভাষা রক্ষার জন্যও যথাযথ ভূমিকা পালন করেত হবে। এ জন্য চাই মনস্তাত্ত্বিক স্বাধীনতা; নিজেদের স্বকীয়তা এবং প্রকৃতভাবে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ আমাদের হৃদয়ের ভূখণ্ড, ভালবাসার ঠিকানা। অনেক স্বপ্ন আর আশা নিয়ে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে এ প্রিয় জন্মভূমিকে আমরা মুক্ত করেছি ব্রিটিশের কবল থেকে এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনেও আমাদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। স্বাধীনতার ৪৮ বছরের ইতিহাসে অনেক চড়াই উতরাইয়ের মাঝেও অন্তত অর্ধেক সময় শিশু গণতন্ত্রের সাহচর্য পেয়েছি। কিন্তু নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক ধারার বিলুপ্ত ঘটিয়ে কাঙ্ক্ষিত পদযাত্রা শুরু হয়েও আবারো প্রায় আড়াই যুগ পরে গণতন্ত্রের মানসকন্যা উপাধিধারী ব্যক্তির হাতেই তা হুমকির সম্মুখীন হবে এটা অন্তত জনগণ মেনে নিতে পারছে না। অবিশ্বাস, পরচর্চা-পরনিন্দা, হিংসা, হানাহানি, পরিবারতন্ত্র, ব্যক্তিপূজা এবং পেশিশক্তিসমৃদ্ধ রাজনীতি থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্যে কেয়ারটেকার সরকারের জন্ম হয়েছিল, সেটাকে বেড়ে উঠতে না দিয়ে গলাটিপে হত্যা করার মাধ্যমে আবারো ১৯৭৪ কিংবা নব্বই দশকের এরশাদীয় শাসনের একদলীয় গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বলেই দেশপ্রেমিক জনগণ মনে করে।

অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং সাংস্কৃতিক গোলামি থেকে জাতিকে মুক্ত করে অর্থনৈতিকভাবে নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং স্বকীয় বিশ্বাস আর সংস্কৃতির আদলে দেশ পরিচালনা করাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীতে পশ্চিম পাকিস্তানের সিল মেরে আমাদের কাছেই বিক্রি করা হতো বেশি দামে; শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে দেশের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করা হয়েছিল; এ সকল অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে আমরা মুক্তি চেয়েছিলাম। আর তার ফলেই এতো রক্তপাত, এতো ধ্বংসযজ্ঞ। জাতির বীর সন্তানদের বেহিসেবি ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত

> ”
>
> **বায়ান্ন থেকে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের যে অধিকার আমরা আদায় করেছি, নিজের ভাষাচর্চার যে স্বাধীনতা পেয়েছি সে পথ ধরেই এগিয়ে যেতে চাই আজীবন। ধাপে ধাপে সমৃদ্ধ করতে চাই আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষাকে। কিন্তু আগ্রাসী হায়েনারা আমাদের এ পথচলা কখনো মসৃণ হতে দেয়নি। বিদেশী ভাষাগুলো নানা কৌশলে আমাদের উপর চেপে বসেছে। ইংরেজি এখন দুনিয়ার চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জকে জয় করতেই হবে, তবে আমার মাতৃভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে নয়।**
>
> ”

স্বাধীনদেশে আমরা কী দেখলাম? দেখলাম মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধা হত্যা। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়কের অবমূল্যায়ন। সেক্টর কমান্ডারের মতো বড় বড় দায়িত্ব পালন করেও তিনি স্বাধীন দেশে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাল কাটালেন। এমন চিত্র তো আমরা দেখতে চাইনি?! বর্তমান সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের একক দাবিদার সংগঠন হিসেবে সামনের দিকে ছুটে চলেছে। এ বিষয়গুলো তাদের দাবির সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ তা সকল মহলেই এখন আলোচিত বিষয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, তাদের ঋণস্বীকার করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু স্বাধীনতার পর পরই তারা বাংলাদেশের শান্তি বিঘ্নিত করার প্রয়াসে গ্রামের তথাকথিত কুচক্রী মাতব্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যায়। ফলে প্রথমত সেনাবাহিনী ফেরত নেবার সময় যেমন দেশের সবকিছু লুফে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে তেমনি সদ্য স্বাধীন শিশুরাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে পানির অভাবে শুকিয়ে এবং অপ্রয়োজনীয় সময়ে পানিতে ডুবিয়ে মারার জন্য সর্বনাশা ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে। সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলসহ বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধা এবং মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মতো দেশপ্রেমিক কিছু নিঃস্বার্থ মানুষ সেই লুটপাট ও শোষণ এবং ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুললেও সেদিন বন্ধুত্বের কৃতজ্ঞতায় শাসকশ্রেণী এর ভয়াবহতা নিয়ে হৈ হুল্লোড় না করে বরং অনেকাংশে নীরব থেকেছিল বলেই আজ দেশ যেমন অর্থনীতিতে অন্তঃসারশূন্য তেমনি পদ্মানদীর তীরবর্তী দীর্ঘ এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। পানির হিসসা নিয়ে হাজারো চুক্তি ও চেঁচামেচি করলেও তা পদ্মার বালির পাহাড় অতিক্রম করে না। আজ স্বাধীনতার সাড়ে চার দশক পার করেও সেই প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্রটি মেঘনার উজানে ফারাক্কার মতো টিপাই মুখে বাঁধ নির্মাণের সব আয়োজন সম্পন্ন করেছে। ফারাক্কা যেমন উত্তর বাংলাকে মরুভূমি করেছে, টিপাই মুখের বাঁধ তেমনি পুরো পূর্ব বাংলাকেও মরুভূমি করতে প্রস্তুত। পর্যবেক্ষক মহলকে একটা বিষয় ভাবিয়ে তুলেছে যে, যাদের শাসনামলে ফারাক্কা নির্মিত হলো ঠিক তাদের আমলেই আবার টিপাই মুখে বাঁধ নির্মাণ। অথচ তারা যেমন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের প্রতি সমীহ করে নিজেদেরকে প্রকারান্তরে তাদের অধীনস্থ অবোধ শিশুর মতো জি হুজুর নীতিতে পথ চলছেন, নিত্যনতুন ছকে গোপন চুক্তি করছেন। সে গোপন চুক্তির বিষয়ে মুখ খুললেই আবারদের মতো পরিণতি ভোগ করতে হচ্ছে। ফলে সবার বুকে উত্তাপ থাকলেও মুখে কুলুপ এঁটে নিদারুণ কষ্টচেপে বসে থাকছে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পাঁচদশক পূর্তির উৎসব ঘটা করে পালিত হবার পরিকল্পনা দেখলেও এ পর্যন্ত দেশের মানুষের বিশ্বাসী ধারার কোন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। বাংলাদেশের ইতঃপূর্বের সরকারগুলোর এ ব্যর্থতার সুযোগে বর্তমান সরকার বামপন্থী নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শে ড. কুদরত ই খুদার সেই ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে ধর্মহীন শিক্ষানীতির আষ্টেপৃষ্ঠে জাতিকে বেঁধে ফেলেছে। বাংলাদেশের মতো একটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দেশে এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা মোটেই কল্যাণকর হবে না। ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সৎ ও যোগ্য লোক তৈরি করা মোটেই সম্ভব নয় বলে অভিজ্ঞজন মনে করছেন।

নির্বাচনী ইশতেহারে দিনবদলের ঘোষণা দিয়ে যুবসমাজসহ দেশবাসীকে একটা চমক দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল মহাজোট সরকার।

"

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পাঁচদশক পূর্তির উৎসব ঘটা করে পালিত হবার পরিকল্পনা দেখলেও এ পর্যন্ত দেশের মানুষের বিশ্বাসী ধারার কোন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। বাংলাদেশের ইতঃপূর্বের সরকারগুলোর এ ব্যর্থতার সুযোগে বর্তমান সরকার বামপন্থী নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শে ড. কুদরত ই খুদার সেই ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে ধর্মহীন শিক্ষানীতির আষ্টেপৃষ্ঠে জাতিকে বেঁধে ফেলেছে। বাংলাদেশের মতো একটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দেশে এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা মোটেই কল্যাণকর হবে না। ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সৎ ও যোগ্য লোক তৈরি করা মোটেই সম্ভব নয় বলে অভিজ্ঞজন মনে করছেন।

"

ক্ষমতা হাতে পেয়েই তারা দিন বদলের পরিবর্তে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামবদল, ঘড়ির কাঁটা বদল, এমনকি দেশের অনেক কিছুরই বদলের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। তাদের ছাত্রসংগঠনের যে দৌরাত্ম্য তা জাতিকে শুধু ভাবিয়েই তোলেনি বরং সে ব্যাপারে সরকারের উর্দ্ধতন মহলের বক্তৃতা বিবৃতি প্রদানের মধ্য দিয়ে জাতিকে ব্যাপকভাবে হতাশও করেছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীর নামে আবারো নতুন নতুন ওসমান, শতকী এবং হাজারী ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে; এরকম মন্তব্য এখন খোদ মিডিয়াকর্মীদের। ঘরে ঘরে চাকরি তো দূরের কথা তাদের নিজস্ব দলীয় ক্যাডার ছাড়া কোন সাধারণ মানুষের চাকরি নেই, দলীয় লোকজনকেও গুনতে হচ্ছে বিশাল অংকের টাকা। অন্য দিকে শেয়ারবাজার লুট, হলমার্ক অর্থকেলেঙ্কারি, ডেসটিনিকে নিয়ে লুকোচুরি খেলাসহ সমস্ত ব্যাংক-বীমা এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এখন হুমকির মুখোমুখি বলে অর্থনীতিবিদগণের মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে। দ্রব্যমূল্য সহনশীল রাখার নামে ধানের যে মূল্য কৃষক পাচ্ছে তাতে তারা ধান উৎপাদন থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। ধানের দাম কমানোর পাশাপাশি প্রয়োজন সার, তেল ও সেচ সরঞ্জাম এবং কীটনাশকের মূল্য কমিয়ে তা কৃষকের কাছে সহজলভ্য করা। স্বাধীনতার পরে সবচেয়ে দুর্ভাগ্য বয়ে এসেছে কৃষকের। কোন সরকারই নিজেদের কৃষকবান্ধব ভাবতে পছন্দ করেন না। কোটি কোটি টাকা ভোট অর্জনের প্রকল্পে ব্যয় করা হলেও কৃষকের উন্নয়নের জন্য এ পর্যন্ত কোন সরকারই যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। এটা কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে আমাদের জন্য খুব দুর্ভাগ্যজনক বলেই মনে হয়।

সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিনা ভোটে অর্ধেকের বেশি এবং ভোটারবিহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়ে সরকার বিজয়ের নতুন নতুন রূপ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। ভোটের আগের রাতের বিজয়ী সরকার বলেই এ সরকারের খ্যাতির খবর শোনা যায় সর্বমহলে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সমূহেও আর ভোটার কিংবা অন্যকোন প্রার্থীর প্রয়োজন পড়ে না। মনোনীত হওয়া মানেই তিনি সেই পদের অধিষ্ঠিত ব্যক্তি– এমন কথা এখন খোদ খেটে খাওয়া মানুষদেরও মুখে মুখে। সেই প্রক্রিয়াতেই বিরোধী দলের প্রতি হামলা-মামলা নিয়েই এগুচ্ছে বলে সর্বমহলে অভিযোগ উঠেছে। সেইসাথে ভয়াল ২৮ অক্টোবরের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটছে বিরোধীমতের কর্মীদের উপর। এহেন অপকর্ম থেকে রেহাই পাচ্ছেন না বিশ্বজিতের মতো নিরীহ পথচারীরাও। কথায় কথায় গুলি করে মানুষ হত্যাসহ গ্রেফতারের ক্ষেত্রে পুলিশি কোটার খবর এখন জনসাধারণের মুখে মুখে। কোটা পুরণে সাধারণ ছাত্র থেকে শুরু করে নিরীহ মানুষও রেহাই পায় না। গ্রেফতার মানেই টাকার খেলা। এটাকে চাঁদাবাজির নতুন কৌশল হিসেবেও দেখেন সচেতন মহল। ফলে পুলিশ-জনতা মুখোমুখি অবস্থানের মতো এক ভয়াবহ অবস্থার দিকে এগিয়ে গেছে আমাদের বাংলাদেশ। গাড়ি পোড়ানোর মামলায় গ্রেফতারের অজুহাত যখন প্রধান রাজনৈতিক দলের মহাসচিব পর্যন্ত পৌঁছে তখন দায়িত্বপরায়ণতার দিক থেকে সরকার নিজেকে গণবান্ধব হিসেবে গর্ব করতেই পারেন; কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয় এবং নিজ দলের ক্যাডারদের হাতে প্রকাশে হত্যা-খুনের পরও কোন টুঁ শব্দটিও আসে না তখন এটাকে

”

বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বা জিডিপি অর্জনে শিল্পের অবদান ৩৩.৭১ শতাংশ। শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিক-কর্মচারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষিত খুব একটা সুখকর নয়। ফার্স্ট জেনারেশন মালিক গোষ্ঠীর কূটচালে দীর্ঘকাল ধরেই এ দেশের মেহনতি শ্রমিক সমাজ প্রকৃত মজুরি, অর্থনৈতিক সুষম বণ্টনব্যবস্থা, সর্বোপরি সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের সুবিধা, যেমন- স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধা, রেশন, ডরমেটরি, ডে-কেয়ার সেবা প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত।

”

কোন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যাবে? এহেন পরিস্থিতিতে দেশ কোন দিকে যাচ্ছে? এমন প্রশ্ন সচেতন মহলের।

বিজয় ও স্বাধীনতার মাসে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার ত্বরান্বিত করার উৎসব চালানো হয়। আদালতের নাম দেয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। কিন্তু এ আদালতের সেই মানের ব্যাপারে শুরু থেকেই প্রশ্ন উত্থাপিত হলেও ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব নিয়ামুল হকের স্কাইপি সংলাপ জাতিকে হতবাক করেছিল। ইতোমধ্যে সেই সংলাপকে ঘিরে বুদ্ধিজীবী মহল এবং আইনবিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি উঠেছিল। তিনি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করলেও বিচার বিভাগ অবমাননার দায় প্রশ্নবিদ্ধ অবস্থাতেই মাটিচাপা পড়েছে। বিচারপতি এস কে সিনহার বিষয়টিও চোখের আড়ালে ফেলতে সক্ষমতা দেখাচ্ছেন সরকার। বিচারকের বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার নিয়েও প্রশ্ন উঠতে দেখা যায় বিশ্লেষক মহলে। বিরোধী জোটসহ সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন নিষ্পেষণ চালিয়ে সবাইকে আতঙ্কগ্রস্ত করে সরকার ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের সফল চেষ্টা করে এসেছে বলে সুধীমহলে প্রচারিত। বিশিষ্ট খল অভিনেতা হিসেবে খ্যাত সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ চলে গেলেন টানাটানির মধ্য দিয়েই। সরকারের অসহনীয় দমননীতির পরও দেশপ্রেমিক ইসলামী শক্তিগুলো পুলিশি নির্যাতনের মুখে আন্দোলনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। জোটপ্রধান বিএনপি আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেকাংশে নমনীয়নীতি গ্রহণ করায় খোদ সরকারের মন্ত্রীরাই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন 'আন্দোলনের মুরদ নেই'। এমতাবস্থায় বিরোধী জোটের কঠোর আন্দোলনে যাওয়া অনেকটা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। অনেকটা সে অপবাদ ঘুচাতেই গত ৫ জানুয়ারি থেকে ২০ দলীয় জোট কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি প্রদান করলেও কোন লাভ হয়নি। এ আন্দোলনে সাধারণ নিরীহ মানুষ যেমন মারা গেছেন তেমনি অসংখ্য নিরীহ নেতাকর্মীও গুম খুনের শিকার হয়েছেন। বিনা অপরাধে কারাবরণ করেছেন হাজার হাজার নেতাকর্মী। বর্ষীয়ান জোটনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অসুস্থতার চরম পর্যায়েও মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে কারাগারেই কাল কাটাচ্ছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও শ্রমজীবী মানুষ

বাংলাদেশে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে দ্রুতগতিতে। প্রতি বছর এ দেশের শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে প্রায় ২৮ থেকে ২৯ লাখ নতুন শ্রমিক। এই সহজলভ্যতা বা শ্রমিক আধিক্যের সুযোগে কম মূল্যে লুফে নিচ্ছে মালিকপক্ষ, কমে যাচ্ছে শ্রমের মূল্য। সরকারের পক্ষ থেকে শ্রম আইনের মাধ্যমে যতটুকু অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, সেটুকুরও বাস্তবায়ন শিল্প-কারখানাগুলোতে প্রতিফলিত হয় না। অথচ আজ বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বা জিডিপি অর্জনে শিল্পের অবদান ৩৩.৭১ শতাংশ। শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিক-কর্মচারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষিত খুব একটা সুখকর নয়। ফার্স্ট জেনারেশন মালিক গোষ্ঠীর কূটচালে দীর্ঘকাল ধরেই এ দেশের মেহনতি শ্রমিক সমাজ প্রকৃত মজুরি, অর্থনৈতিক সুষম বন্টনব্যবস্থা, সর্বোপরি সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের সুবিধা, যেমন- স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধা, রেশন, ডরমেটরি, ডে-কেয়ার সেবা প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত।

বাংলাদেশের শ্রমের ক্ষেত্র এখন মূলত ফরমাল ও ইনফরমাল দুই ভাগে বিস্তৃত। ফরমাল খাতের পরিসর ছোট। পক্ষান্তরে এ দেশে এখন ইনফরমাল খাতে কাজ করে কয়েক কোটি শ্রমিক-কর্মচারী। ফরমাল খাতে সরকারি নজরদারি বা রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় শ্রমিকদের একটি নিয়োগপত্রের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে বিধায় সেসব প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জীবনমান কিছুটা উন্নত বা সুরক্ষিত। অন্যদিকে ইনফরমাল খাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনমান সম্পূর্ণভাবে মালিকদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। অনেক ক্ষেত্রে মালিকরা আইন-কানুনের তোয়াক্কা করেন না। বর্তমানে যে দেশগুলো উন্নত হয়েছে সেখানে শিল্প-শ্রমিকের আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়নের মধ্য দিয়েই তা বিকশিত হয়েছে। সেখানে সমসাময়িক জীবনযাপনের মান বাজারব্যবস্থা শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তাবলয় সৃষ্টি করে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হয়ে আসছে। বিনিময়ে শ্রমদাতা পাচ্ছেন তাঁর প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সুরক্ষা। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের শ্রমবাজারের চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে, মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমাদের শ্রমিক-কর্মচারীরা বিশাল সংখ্যায় অংশ নিয়েছেন এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মেহনতি শ্রমিক সমাজ নবোদ্যোগে দেশ বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। কিন্তু বিনিময়ে বেঁচে থাকার মতো মজুরি বা অধিকারের ক্ষেত্রে তাঁরা বঞ্চিত। বঞ্চিত সামাজিক সুরক্ষা থেকে। আমাদের দেশের শ্রমখাতে আজ বিপুলসংখ্যক নারীশ্রমিক কাজ করছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আজও মজুরি প্রাপ্তি বা অন্যান্য সুরক্ষা প্রাপ্তিতে নারীরা চরমভাবে বঞ্চিত এবং বৈষম্যের শিকার। রাষ্ট্রীয়ভাবে নীতিনির্ধারণে নারীকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নারীর শ্রম, মেধা ও কষ্টসহিষ্ণুতাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে গৃহস্থালি, পরিচারিকা, গার্মেন্টস, কৃষি খাত, চাতাল, নির্মাণ খাত, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন ও অন্যান্য খাত মিলিয়ে বাংলাদেশের ৫৮ শতাংশ খাতে নারীরা নানাভাবে অবদান রেখে চলেছেন। কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ কাজের শ্রমবান্ধব সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্ব প্রদান এখন সময়ের দাবি। সব ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের বাঁচার মতো মজুরি বা প্রকৃত আয়, সামাজিক সুরক্ষা, ব্যক্তিত্ব বিকাশের নিরাপত্তা ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা জরুরি।

পরিশেষে বলা যায়, শ্রমিক বাঁচলেই শিল্প বাঁচবে, শিল্প বাঁচলে দেশ বাঁচবে, বাঁচবে এ দেশের অর্থনীতি। এখানেই সরকারের মূল দায়িত্ব। অর্থনীতি ও টেকসই উৎপাদন খাতকে মজবুত করতে শ্রমিক ও তাদের সংগঠন ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকাকে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে আস্থা তৈরির মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। উৎপাদনের স্বার্থে শ্রমিককে আস্থায় নিয়ে কাজ করার কোনো বিকল্প নেই। শ্রমিকদের প্রতি বৈরী মনোভাব না দেখিয়ে বা প্রতিপক্ষ না ভেবে তাদের উৎপাদনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ বিবেচনা করতে হবে। দলমত, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। কথা বলার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে ভাষার মাসের অঙ্গীকার। ভাষা-বিপ্লবের মাস পেরিয়ে স্বাধীনতার মাসের দাবি, শ্রমজীবী মানুষসহ সকল নাগরিকের জীবন-জীবিকা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সব ধরনের নিরাপত্তা প্রদান করে গড়ে তুলতে হবে সত্যিকারের সোনার বাংলাদেশ।

লেখক : কবি ও গবেষক; প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রানাডা ট্র্যাজেডি মুসলিম উম্মাহর রক্তাক্ত ইতিহাস আমাদের সতর্কতা

অ্যাডভোকেট আবু তাহের

আজ থেকে প্রায় পাঁচশত একত্রিশ বছর আগের কথা। ১৪৯২ সালের ১ এপ্রিল মুসলিম শাসনের গৌরবোজ্জ্বল জনপদ স্পেনের রাজধানী গ্রানাডায় খ্রিষ্টানদের সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে অসংখ্য নারী-পুরুষকে হত্যা করে আর মুসলিমদের বোকা বানানোর এ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে আসল ঘটনা চাপা দিয়ে ১৫০০ সালের ১ এপ্রিল থেকে খ্রিষ্টান জগতে এ দিনটিকে হাসি-ঠাট্টা এবং মিথ্যা প্রেম দেয়া-নেয়ার দিন হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করে আসছে, আর আমরা মুসলমানেরাও বিশেষ করে বাঙালিরা সেই তালে তাল মিলিয়ে 'উৎসব সবার' হিসেবে নিয়মিত পালন করে আসছি!

আমরা বাঙালিরাই সম্ভবত জন্মগতভাবেই উৎসবপ্রেমী। যে কোন উৎসব আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে পালন করতে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি। আমরা কোন বাছ-বিচার ছাড়াই সকল উৎসব পালন করে থাকি। কোন দিবসের কী প্রেক্ষাপট সেদিকে আমরা মোটেও তাকাই না। আর এ কারণেই আমরা পহেলা বৈশাখ রাস্তায় বিভিন্ন পশু-পাখির মূর্তি নিয়ে নামি মঙ্গল শোভাযাত্রার নামে। ফেব্রুয়ারি আসলেই আমাদের ভালোবাসা বেড়ে যায়। বিশ্বভালবাসার নামে আমরা সেটাও পালন করি উৎসবমুখর পরিবেশে। সবকিছু মিলিয়েই হয়তো আমরা আমাদের জন্য বেছে নিয়েছি সেই ঐতিহাসিক স্লোগান- 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'। আর এই উৎসবের ধারাবাহিকতায় দীর্ঘদিন থেকে পালন করে আসছি আরও একটি দিবস সেটা হলো 'এপ্রিল ফুল'। অর্থাৎ এপ্রিলের বোকা। পহেলা এপ্রিল কাউকে বোকা বানানোর মধ্য দিয়ে আমরা এই দিবসটি পালন করে থাকি। দুঃখের বিষয় হলো, আমরা একটিবারও ভেবে দেখার চেষ্টা করি না যে, এই 'এপ্রিল ফুল' এর উৎস কী, উৎপত্তি কোথায়! আসুন আমরা এখন এই বিষয়ে কিছুটা জানার চেষ্টা করি।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশত একত্রিশ বছর আগের কথা। ১৪৯২ সালের ১ এপ্রিল মুসলিম শাসনের গৌরবোজ্জ্বল জনপদ স্পেনের রাজধানী গ্রানাডায় খ্রিষ্টানদের সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে অসংখ্য নারী-পুরুষকে হত্যা করে আর মুসলিমদের বোকা বানানোর এ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে আসল ঘটনা চাপা দিয়ে ১৫০০ সালের ১ এপ্রিল থেকে খ্রিষ্টান জগতে এ দিনটিকে হাসি-ঠাট্টা এবং মিথ্যা প্রেম দেয়া-নেয়ার দিন হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করে আসছে, আর আমরা মুসলমানেরাও বিশেষ করে বাঙালিরা সেই তালে তাল মিলিয়ে 'উৎসব সবার' হিসেবে নিয়মিত পালন করে আসছি!

চলুন আমরা এ বিষয়টি আরও ভালোভাবে জানার জন্য শুরু থেকেই শুরু করি। ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমে আইবেরীয় উপদ্বীপে অবস্থিত স্পেন মুসলিম আমলে আন্দালুসিয়া নামে পরিচিত ছিলো। মুসলিম বিজয়ের ফলে ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ৭১১ সালে এবং এই সার্বভৌমত্ব ১৪৯২ সালে মুসলমানদের স্পেন থেকে বিতাড়িত হবার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় আটশত বছর অপ্রতিহতও অলঙ্ঘনীয় ছিলো। গোয়াদেল কুইভার নদীর তীরে মুসলিম স্পেনের সমৃদ্ধ নগরী কর্ডোভা অবস্থিত। মুসলিম আমলে কর্ডোভা, গ্রানাডা, সেভিল ইউরোপের সুসমৃদ্ধ নগরী হিসেবে পরিচিত হয়।

একটা বিষয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, প্রাক-মুসলিম যুগে স্পেনের অবস্থান এমনটা ছিলো না। ৭১১ সালে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। প্রাক-মুসলিম যুগে স্পেন গথিক রাজাদের অধীনস্থ ছিল। গথগণ (Goths) তিন শতাব্দী ধরে (৪০৯-৭১২ খ্রি:) স্পেন শাসন করেন। গথিক শাসনামলে স্পেনের রাজনৈতিক অরাজকতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং ধর্মীয় বিভেদ চরম আকার ধারণ করে। গথিক স্পেনের সমাজব্যবস্থা ছিলো ঘৃণ্য। সমাজে সুবিধাভোগকারী তিনটি পৃথক শ্রেণী ছিলো। (ক) অভিজাত সম্প্রদায়। (খ) মধ্যবিত্ত ভূস্বামীবৃন্দ। (গ) ক্রীতদাসগণ। এর মাধ্যমে তারা একে অপরের দ্বারা নিগৃহীত হতো। ঐতিহাসিক আমীর আলীর ভাষায়- "তাদের নৈতিক চরিত্র যেমন কলুষিত ছিলো তেমনি তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিলো শোচনীয়।"

প্রাক-মুসলিম যুগে স্পেনে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতা ছিলো না। ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান ছিলো দু'টি- (ক) খ্রিষ্টান ও (খ) ইহুদি। শাসক ও যাজক সম্প্রদায় খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ৬১৬ সালে গথিক রাজা সিসিবুত এই মর্মে এক ফরমান জারি করেন যে, ইহুদিগণ খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত না হলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত অথবা নির্বাসিত করা হবে। এই আদেশ কার্যকরী করে ৬১২ থেকে ৬২০ সালের মধ্যে প্রায় ৯০,০০০ ইহুদিকে বলপূর্বক খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। ইতিহাসবিদ এডউইন হোল বলেন- "সপ্তম শতাব্দীর Fuero Juzgo ইহুদিদের সৎকার, খাতনা এবং বিবাহ উৎসব নিষিদ্ধ করে এবং যে ইহুদি তার সন্তানকে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষা না করতো তাকে একশতবার বেত্রাঘাত করা হতো, জমি বাজেয়াপ্ত করা হতো এবং তার মস্তক মুণ্ডন করা হতো।"

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনে উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে মারাত্মক রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। ৬৮৭ সালে তলেডোর সিংহাসনে উইটিযা উপবিষ্ট ছিলেন। ক্ষমতা লাভ করে তিনি তার পুত্র অচিলকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন এবং পরবর্তীকালে তাকে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করা হয়। কিন্তু উইটিযা বংশের প্রতিদ্বন্দ্বী তারাকোনেনসিস নামীয় একটি গোত্র অচিলার স্থলে রডারিককে রাজা নির্বাচিত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে রডারিক উইটিযাকে হত্যা করে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। ক্ষমতা দখল করে তলেডোর সিংহাসনে আরোহণ করে রডারিক উইটিযার পুত্র ও উত্তরাধিকারী অচিলাকে গ্যালিসিয়ায় বিতাড়িত করেন। বলপূর্বক সিংহাসন অধিকারী হিসেবে রডারিক শান্তিতে রাজ্য শাসন করতে পারেননি। উইটিযার জামাতা কাউন্ট জুলিয়ান উইটিযার আমলে সিউটা ও আলজিয়ার্সের গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি রডারিকের স্বৈরাচারী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ফলে প্রাক-মুসলিম ভিসিগথিক স্পেনে সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করে। পাশাপাশি দুর্দশাগ্রস্ত তলেডোর নাগরিকবৃন্দ যেন মুসলমানদের আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। আর এসব কারণেই মুসলমানদের জন্য স্পেন বিজয় সহজ হয়।

যখন গোটা ইউরোপে ক্রান্তিকাল চলছিলো, তখন মুসলিম রণক্ষেত্রের প্রধান কমান্ডার ছিলেন মুসা বিন নুসায়ের। উইটিযার জামাতা কাউন্ট জুলিয়ান তার রাজ্যের মজলুম জনগণকে রডারিকের স্বৈরাচারী একনায়কত্ব থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি মুসা বিন নুসায়েরকে আহবান করেন। মুসা বিন নুসায়ের তার অধীনের সেনাপতি তারেক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে সাত হাজার সৈন্যের একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করেন। ৯২ হিজরি ২৮ রমজান মোতাবেক ৭১১ সালের জুলাই মাসে মুজাহিদ বাহিনী স্পেনে পা রাখেন। তিনি সর্বপ্রথম সে স্থানে অবতরণ করেন তা আজও 'জবল আত তারিক' নামে পরিচিত। যার বর্তমান বিকৃত নাম হলো জিব্রালটার। তারিকের পাহাড়ে অবতরণ করে সেনাপতি সমগ্র এলাকা পরিদর্শন করেন এবং সেখানে 'রায়াত' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন অতঃপর তিনি 'জবল আত তারিক'কে সুগঠিত করার ব্যবস্থা করে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে কারতেয়া এবং ল্যাগ দ্য জান্ডা দখল করেন। পর্যায়ক্রমে দীর্ঘ যুদ্ধের পর রডারিকের খ্রিষ্টান বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পরাজিত হয়। এরপর থেকেই শুরু হয় মুসলিম শাসন।

মুসলমানরা যখন স্পেন শাসন করছিলেন তখন সেখানে সব ধর্মের সকল মানুষ অত্যন্ত সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন। স্পেন হয়ে উঠলো একটি ভূস্বর্গ। ঐতিহাসিক ডোজি

> "মুসলমানরা যখন স্পেন শাসন করছিলেন তখন সেখানে সব ধর্মের সকল মানুষ অত্যন্ত সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন। স্পেন হয়ে উঠলো একটি ভূস্বর্গ। ঐতিহাসিক ডোজি বলেন, কর্ডোভায় বিস্ময়কর রাজ্য সংগঠন করে একে মধ্য যুগের বিস্ময়ে পরিণত করেন এবং সমগ্র ইউরোপ যেন বর্বরোচিত, অজ্ঞতা, কলহে নিমজ্জিত তখন কর্ডোভা দুনিয়ার সামনে শিক্ষা ও সভ্যতার উজ্জ্বল ও দীপ্ত মশাল বহন করে।" ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন- "মধ্যযুগীয় ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাসে স্পেন একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে।" মুসলিম শাসন আমলে স্পেন পরিণত হয়েছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্গরাজ্যে।"

বলেন, কর্ডোভায় বিস্ময়কর রাজ্য সংগঠন করে একে মধ্য যুগের বিস্ময়ে পরিণত করেন এবং সমগ্র ইউরোপ যেন বর্বরোচিত, অজ্ঞতা, কলহে নিমজ্জিত তখন কর্ডোভা দুনিয়ার সামনে শিক্ষা ও সভ্যতার উজ্জ্বল ও দীপ্ত মশাল বহন করে।" ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন- "মধ্যযুগীয় ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাসে স্পেন একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে।" মুসলিম শাসন আমলে স্পেন পরিণত হয়েছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্গরাজ্যে। তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় শুধু কর্ডোভাতেই ছয়শরও বেশি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে লাইব্রেরি ছিলো তাতে বইয়ের সংখ্যা ছিলো চার লাখেরও বেশি। নানা ভাষার নানা বই এ পাঠাগারে ছিলো। বলা হয়ে থাকে যে, শুধু স্পেনের খলিফার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতেই চল্লিশ হাজার বই ছিলো। সে পরিমাণ বই তখন সারা ইউরোপেও ছিলো না।

কর্ডোভা তখন ছিলো বিশ্বমানের একটি শহর, যা অনুন্নত ও শিক্ষাহীন ইউরোপের সাথে সমৃদ্ধ সংস্কৃতির মুসলিম পৃথিবীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতো। ইউরোপের মধ্যে যারা শিক্ষিত হতে চাইতো তারাও আন্দালুসে গমন করতো। কেননা সেখানেই তারা বড় বড় পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ সব লাইব্রেরির দেখা পেত। এমনকি দশম শতকের বিখ্যাত পোপ দ্বিতীয় সিলভিস্টারও তার যৌবনকালে আন্দালুস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের অনবদ্য সব আবিষ্কার দেখে বিমোহিত হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে যখন ইতালি, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সেখানকার লাইব্রেরিতে যে বইগুলো ছিলো সে সবই ছিলো কর্ডোভার এই লাইব্রেরিগুলোর ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ সংস্করণ। মুসলিম স্পেন হলো সে স্থান যার মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বের চিন্তা ও দর্শনগুলো ইউরোপে প্রবেশ করে। যার উপর ভর করেই চৌদ্দ শতকে ইউরোপে রেনেসাঁ তথা শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়।

তৃতীয় আব্দুর রহমান কর্ডোভার বাইরে মদিনা আল জাহরা নামক অপূর্ব এক শহর প্রতিষ্ঠা করেন যা সে সময়ের সবচেয়ে সুন্দর শহর হিসেবে স্বীকৃত হয়। আর শুধু এক কর্ডোভাতেই এত সব নান্দনিক স্থাপনা থাকার কারণে ইউরোপের লোকেরা কর্ডোভাকে 'অরনামেন্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড' বা পৃথিবীর অলঙ্কার হিসেবেই সম্বোধন করতো। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, জ্ঞান ও নান্দনিক স্থাপত্যে আন্দালুসের এই উৎকর্ষতা এই শহরের মানুষের জন্য বেদনার কারণ হয়েছিলো। তারা এতটাই বিলাসিতা এবং আত্মতৃপ্তিতে ডুবে ছিলো যে, যখন সেখানে বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলো তখন নাগরিকেরা তাদের বিলাসিতা ছেড়ে যুদ্ধ বিগ্রহে যেতে চাচ্ছিলো না। কর্ডোভার শাসকেরা শত চেষ্টা করেও উত্তর থেকে আসা খ্রিষ্টান সেনাদের মোকাবেলা করার জন্য শহরের মুসলিমদের যুদ্ধের ময়দানে টেনে নিয়ে যেতে পারলো না। আন্দালুসের নাগরিকেরা নিজেদের প্রমোদ জীবন ছেড়ে মুসলিম স্পেনের রক্ষায় এগিয়ে যেতে মোটেই আগ্রহী ছিলো না।

১১ শতকের শুরুতে উমাইয়া এবং তাদের সমর্থকদের ক্ষমতা নিয়ে ব্যাপক লড়াই ও সংঘাত শুরু হয় ফলে বহিঃশত্রুকে মোকাবেলা করার চেয়ে শহরের অভিজাত সম্প্রদায় কর্ডোভাতেই নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘায়েল করতে বেশি ইচ্ছুক ছিলো। এমনকি নিজেদের খায়েশকে পূরণ করার জন্য তারা উত্তরের খ্রিষ্টান ও আফ্রিকার বার্বারদেরও নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টায় রত ছিলো। মুসলিম আন্দালুসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ইতিহাস হলো, মুসলিমরা তাদের আরেক ভাইকে শায়েস্তা করার জন্য খ্রিষ্টানদের অর্থ সাহায্য দিচ্ছিলো। পরিণামে গোটা এলাকাতেই মুসলিমরা নিজেদের অধিকৃত জমিগুলো হারিয়ে ফেললো। আর খ্রিষ্টানরা সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠলো। ১০৮৫ সালে মুসলিম টলেডো খ্রিষ্টানদের কাছে পরাজিত হয়, যা একটি ঐতিহাসিক কৌশলগত লোকসান হিসেবে বিবেচিত হয়। অবস্থা যখন এই পর্যায়ে তখন অন্যদিকে ঘটলো আরেক ঘটনা। ১৪৬৯ সালে এরাগন রাজা (ফার্ডিন্যান্ড) এবং স্পেনে মুসলিম সভ্যতার অস্তিত্বকে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রায় এক শতাব্দী খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের বিভাজন ও আনুষঙ্গিক দুর্বলতার ফায়দা হাসিল করে। এ পর্যায়ে তৎকালীন পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট নতুন করে একটি প্যান-ইউরোপিয়ান ক্রুসেডের ডাক দেন। এতে করে মুয়াহিদুনদের (একটি সংগঠনের নাম, যার অর্থ তাওহিদপন্থী) সাথে ক্রুসেডারদের প্রচণ্ড লড়াই হয়। আর এই লড়াইয়ে প্রায় এক লাখ মুসলিম সেনা শাহাদাৎ বরণ করেন। এবং আন্দালুসে ক্ষমতার মূল ভিত্তিরই পতন ঘটে।

এই যুদ্ধের পরই মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণাধীন এক একটি শহর পায়ে লুটিয়ে পড়তে থাকে। ১২২৮-১২৪৮ সালের মধ্যে ভ্যালেন্সিয়া, সেভিল, বাডাজোস, মাজরোকা, মুর্সিয়া, জায়েন এবং অন্য আরও কয়েকটি শহর খ্রিষ্টানদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ১২৩৬ সালে মুসলিম কর্ডোভারও পতন হয়। সেই শহরের বিশাল মসজিদ, অসংখ্য লাইব্রেরি, প্রাসাদ এবং উদ্যান কোন কিছুই আগ্রাসী খ্রিষ্টানদের থামাতে পারে নাই। খ্রিষ্টানরা শহরটি দখল করে নেয়ার পরই কর্ডোভার বিশাল সেই মসজিদকে ক্যাথলিক ক্যাথেড্রালে পরিণত করা হয়। সেই ক্যাথেড্রালে তথা সাবেক সেই মসজিদের মাঝে বিরাট এক ঘন্টা বসানো হয়। যে মসজিদটি মক্কার দিকে মুখ করে বানানো হয়েছিলো সেটা তাই থাকে কিন্তু তাতে সব খ্রিষ্টান স্থাপনা বসানো হয়। মসজিদটির দেয়াল আজও যেন মুসলিম এবাদতকারীদের জন্য কান্না করে। কেননা, ক্যাথেড্রাল বানানোর পরও এখনও যদি কেউ তাতে প্রবেশ করে তাহলে এটাকে মসজিদই মনে হবে। পরবর্তীকালে ১৬ শতকে এসে রোমান সম্রাট একে ক্যাথেড্রাল হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।

আন্দালুসের চারপাশের পতনের মধ্যে গ্রানাডা একমাত্র মুসলিম নিয়ন্ত্রণাধীন হিসেবে টিকে ছিলো। তবে গ্রানাডার চারপাশে রাজনৈতিক অবস্থা প্রতিনিয়ত খারাপ হচ্ছিলো। যা গ্রানাডাকে চূড়ান্ত পতনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তবে মুসলিম স্পেনের সর্বশেষ এই বাতিঘরের পতনটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত বহিঃশত্রুর আগমনে হয়নি বরং হয়েছিলো নিজেদের মধ্যকার বিভাজনের কারণে। ১৪৮০ সালের দিকে গ্রানাডায় ব্যাপক অর্থে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এবং পারিবারিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। তৎকালীন আমীর আবুল হাসানকে তারই সন্তান ৭ম মোহাম্মদ ক্ষমতা থেকে উৎখাত করেন এবং ১৪৮২ সালে নিজেই ক্ষমতায় আসীন হন। তিনি স্থানীয় কিছু পণ্ডিতের উসকানিতে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হন, যা আইবেরিয়ান উপদ্বীপে ইসলামের চূড়ান্ত পতন নিশ্চিত করে দেয়। ১৪৫৩ সালে অটোম্যানরা কনস্টানটিনোপল জয় করার জন্য যে কামান ব্যবহার করেছিলো এবং যার মাধ্যমে তারা পূর্ব ইউরোপে যাত্রা শুরু করেছিলো, সেই কামান ব্যবহার করেই খ্রিষ্টানরা পশ্চিম ইউরোপ থেকে ইসলামকে বিলুপ্ত করার উদ্যোগ নেয়।

৭ম মোহাম্মদের নেতৃত্বে গ্রানাডার জন্য দুঃখ বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। খ্রিষ্টানরা ১৪৮৬ সালে ৭ম মোহাম্মদকে গ্রেফতার করে। সে সুযোগে তার বাবা পুনরায় সিংহাসনটি পুনরুদ্ধার করেন। এক বছর পর খ্রিষ্টানদের আনুগত্য করার শর্তে ৭ম মোহাম্মদকে মুক্তি দেয়া হয়। খ্রিষ্টানদের সামরিক সহযোগিতা নিয়ে তিনি আবার গ্রানাডায়

নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে গ্রানাডায় আবার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। আর এই যাত্রায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো তারই চাচা।

এই যখন অবস্থা তখন বিখ্যাত শাসক (ফার্ডিন্যান্ড) এবং ইসাবেলা উদ্যোগ নিয়ে খ্রিষ্টানদের দুই গ্রুপ অর্থাৎ ক্যাস্টাইল ও অ্যারাগনদের একত্রিত করে। যাতে উত্তর স্পেনে তারা নির্বিঘ্নে অভিযান চালাতে পারে। যেহেতু স্পেনের বড় অংশই ততদিনে খ্রিষ্টানদের নিয়ন্ত্রণে তাই তারা গ্রানাডাকে আর মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে দেখতে চাইছিলো না। যদিও ৭ম মোহাম্মদ তার পূর্বসূরিদের মতই খ্রিষ্টানদের খাজনা অব্যাহতভাবে দিয়ে যেতে চাইছিলেন, তা সত্ত্বেও খ্রিষ্টানরা আর গ্রানাডার পৃথক মুসলিম অস্তিত্বকে সহ্য করতে পারছিলো না।

১৪৯০-৯১ সালে যখন চূড়ান্ত পতনের ক্ষণে ছিলো তখন শহরের মানুষগুলো শহরের ভিতরে অনেকটা নিঃসঙ্গ হয়েই জীবন-যাপন করছিলো। বাইরের জগতের সাথে তাদের যোগাযোগ এবং জীবন ধারণের উপকরণগুলোর সরবরাহ অনেকটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। শহরের উদ্বাস্তুর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিলো আর স্থানীয় মানুষগুলো বড় আকারের হতাশায় ডুবে গিয়েছিলো। যেহেতু তারা উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাচ্ছিলো না, তাই গ্রানাডার পক্ষে সংখ্যায় এবং প্রযুক্তিতে উৎকর্ষতায় থাকা স্প্যানিশদের মোকাবিলা করা কঠিন ছিলো।

আইবেরিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে আর আন্দালুসে যখন ইসলাম প্রায় নিঃশেষ হওয়ার মুখে তখনও মুসলমানরা তাদের স্থাপত্য নিদর্শনের আরেকটি নমুনা রেখে যায়। যা ছিলো মুসলিম স্পেনে তাদের সর্বশেষ স্মৃতিচিহ্ন, এর নাম হলো আলহামরা। গ্রানাডার আমীর এই দুর্গটিকেই প্রাসাদে রূপান্তরিত করেন। আলহামরার সবচেয়ে বড় নির্মাণ বৈশিষ্ট্য ছিলো এর মূল বার্তা, যেটা আলহামরার চূড়ায় থাকা পতাকায় লেখা ছিলো। কথাটি ছিলো, "লা গালিব ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন বিজয়ী নেই। এটা ছিলো মুসলিম আন্দালুসের সকল কর্মকান্ডের অন্তর্নিহিত চেতনা। এমনকি পরবর্তী সময়ে শত্রুরা যখন গ্রানাডা ঘেরাও করে ফেলে তখনও মুসলিমদের মনে এই বিশ্বাসটাই লুক্কায়িত ছিলো যে, ইসলাম রাজনৈতিকভাবে আন্দালুসে অনেকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়লেও আল্লাহ তায়ালা কখনও মুসলিমদের চূড়ান্ত পতনের মুখে ফেলবেন না।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হলো, ১৪৯২ সালে যখন খ্রিষ্টানরা গ্রানাডাকে দখল করে নেয়, তখনও এই মসজিদের দেয়ালে সে কথাটি ঠিকই লেখা ছিলো। কিন্তু মুসলিমদের যে সাহসী ও ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা থাকার কথা ছিলো সেটা ছিলো না।

রানী ইসাবেলা এবং রাজা (ফার্ডিন্যান্ডের) বিশাল বাহিনী যখন ১৪৯২ সালের ১ এপ্রিল চতুর্দিক থেকে মুসলমাদেরকে ঘেরাও করার পর পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে, ইতিহাস সাক্ষী দেয়, যখন খ্রিষ্টানদের সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছিলো, তখনও মুসলমান রাজা-বাদশাদের হেরেমগুলো মদ ও নর্তকী দ্বারা ভরপুর ছিলো আর তারা সেগুলো নিয়েই মত্ত ছিলো। নেতৃত্বহীন নিরীহ অপ্রস্তুত মুসলমানরা বুকভরা আশা নিয়ে রাজধানী গ্রানাডায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

দিশেহারা মুসলমানদের অবস্থা যখন প্রকট রূপ ধারণ করলো, তখন ধূর্তবাজ (ফার্ডিন্যান্ড) ঘোষণা দেয়, যে মুসলমানরা অস্ত্র সমর্পণপূর্বক মসজিদসমূহে আশ্রয় নিবে তাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে এবং যারা সমুদ্রের জাহাজসমূহে আশ্রয় নিবে তাদেরকে অন্যান্য মুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে। নেতৃত্বহীন অসহায় মুসলমানরা অস্ত্রহীন ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে অধৈর্য হয়ে পড়েছিলো। তারা নরপিশাচদের প্রতারণা না বুঝে সরলমনে মসজিদ এবং জাহাজসমূহে আশ্রয় নেয়। তখনই জালিম নরপিশাচ প্রতারক রাজা (ফার্ডিন্যান্ডের) নির্দেশে খ্রিষ্টান সৈন্যরা মসজিদসমূহের তালা বন্ধ করে দিয়ে চতুর্দিকে আগুন লাগিয়ে সেখানে আশ্রয় নেয়া লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে পুড়িয়ে নির্মমভাবে শহীদ করে এবং জাহাজগুলোতে আশ্রিত মুসলমানদেরকে গহিন সমুদ্রে ডুবিয়ে মারে। সেদিন প্রায় ৭ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে গুটিকয়েক ছাড়া সকলেই শাহাদাত বরণ করেন। আর মুসলমানদের এই দুর্দশা দেখে প্রতারক রাজা (ফার্ডিন্যান্ড) তার স্ত্রী রানী ইসাবেলাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ উল্লাসে বলে উঠে Oh Muslim! How fool you are. হায় মুসলমান! তোমরা কত বোকা। সে দিনটি ছিলো এপ্রিল মাসের ১ তারিখ। ইতিহাস সাক্ষী দেয়, সর্বশেষ আমীর সপ্তম মোহাম্মদ যখন নির্বাসনে চলে যান, যাওয়ার আগে তিনি বারবার তার প্রিয় শহরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাচ্ছিলেন আর কান্না করছিলেন। তার মা তখন তাকে বলেছিলেন- "মেয়েলোকের মতো তোমার প্রিয় শহরের জন্য কান্না করো না। কেননা যখন তোমার সময় ছিলো তখন তুমি পুরুষের মতো গর্জে উঠে তাকে রক্ষা করতে পারোনি।"

মুসলমানরা তাদের সেই ইতিহাস আজ ভুলে

"লা গালিব ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন বিজয়ী নেই। এটা ছিলো মুসলিম আন্দালুসের সকল কর্মকান্ডের অন্তর্নিহিত চেতনা। এমনকি পরবর্তী সময়ে শত্রুরা যখন গ্রানাডা ঘেরাও করে ফেলে তখনও মুসলিমদের মনে এই বিশ্বাসটাই লুক্কায়িত ছিলো যে, ইসলাম রাজনৈতিকভাবে আন্দালুসে অনেকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়লেও আল্লাহ তায়ালা কখনও মুসলিমদের চূড়ান্ত পতনের মুখে ফেলবেন না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হলো, ১৪৯২ সালে যখন খ্রিষ্টানরা গ্রানাডাকে দখল করে নেয়, তখনও এই মসজিদের দেয়ালে সে কথাটি ঠিকই লেখা ছিলো। কিন্তু মুসলিমদের যে সাহসী ও ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা থাকার কথা ছিলো সেটা ছিলো না।

যেতে বসেছেন। আজ আমরা নিজেরাই পহেলা এপ্রিলকে 'বোকা বানানোর দিবস' হিসেবে পালন করছি। তা ছাড়া সেই নির্মম ইতিহাস থেকে আমরা তেমন শিক্ষাও নেইনি। আজও আমাদের মুসলিম রাজা-বাদশা আর নেতারা বিলাসিতায় ডুবে আছেন। ২০১৫ সালে সৌদি বাদশা যখন যুক্তরাষ্ট্রে যান তখন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির জর্জটাউন এলাকার ২২২টি কক্ষের ফোরসিজন হোটেলের পুরোটাই বাদশার জন্য ভাড়া নেয়া হয়। খবর এনটিভির এমন অনেক বিলাসিতার কথা আমরা প্রতিনিয়তই শুনে থাকি। অথচ বিশ্বের কত শত মানুষ যে না খেয়ে ঘুমুতে যায় তার কোন হিসাব নাই।

আজকে মুসলিম দেশগুলো কত দিক থেকে আক্রান্ত। মুসলমানেরা মার খাচ্ছে যেখানে-সেখানে। চীন, মিয়ানমারসহ অনেক দেশে মুসলমানদেরকে পুড়িয়ে মারা হলেও সৌদিসহ মুসলিম নেতাদের আজ তেমন কোন উচ্চ-বাচ্য লক্ষ করা যায় না। জারজ, মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোড়া হিসেবে খ্যাত ইসরাইলকে সৌদি আরব এখনও দুধ কলা দিয়ে পুষছে। ২০১৩ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট মুরসিকে অপসারণে ইসরাইলের সাথে একযোগে কাজ করার অভিযোগ আছে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে। মুরসিকে সরাতে কোটি কোটি ডলার অর্থ ব্যয় করার অভিযোগও তাদের বিরুদ্ধে আছে।

গত ১৮ জানুয়ারি ২০২০ মিডল ইস্ট মিররের বরাত দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিদিন একটি রিপোর্ট করেছে- "সৌদি আরবে অবস্থানরত মার্কিন সেনাদের খরচ বাবদ গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রকে ৫০০ মিলিয়ন ডলার দিলো দেশটি। এ ছাড়া নব্বইয়ের দশকে ইরাকের বিরুদ্ধে ছয় মাসের উপসাগরীয় যুদ্ধের খরচ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে ৩৬০০ কোটি ডলার দিয়েছিলো সৌদি আরব ও কুয়েতসহ উপসাগরীয় দেশগুলো।" এভাবে বিলাসিতা আর অমুসলিমদেরকে দিয়ে মুসলিমদেরকে মারার যে কৌশল কিছু মুসলিম দেশ গ্রহণ করেছে তা যে স্পেনের নির্মম ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে তা বুঝার জন্য কোন বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নাই।

২০১২ সালের ১ এপ্রিল দৈনিক সংগ্রামে একটি খবর ছিলো। পত্রিকাটি বলেছে, "১৯৯৩ সালের ১ এপ্রিল গ্রানাডা ট্র্যাজেডির পাঁচশত বছর উৎযাপন উপলক্ষে স্পেনে আড়ম্বরপূর্ণ এক সভায় মিলিত হয়েছিলো বিশ্ব খ্রিষ্টান সম্প্রদায়। সেখানে তারা নতুন করে শপথ নেয় একচ্ছত্র খ্রিষ্টান বিশ্ব প্রতিষ্ঠার। বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণ ঠেকাতে গড়ে তোলা হয় 'হলি মেরি ফান্ড'। এরই ধারাবাহিকতায় গোটা খ্রিষ্টান বিশ্ব নানা অজুহাতে ইরাক, ফিলিস্তিন, সর্বশেষ লিবিয়াসহ মুসলিম দেশগুলোকে একের পর এক আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে। 'জাবাল আল তারেক' অর্থাৎ তারেকের পাহাড় সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে ৭১১ সালে উমাইয়া শাসনামলে মুসলমানেরা তারেক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে ভূমধ্যসাগরের উত্তর তীরস্থ স্পেনকে রক্ষা করেছিলো রডারিকের দুঃশাসন থেকে। আজ মুসলিমবিদ্বেষী ইউরোপিয়ানরা তার নাম বদলে রেখেছে 'জিব্রাল্টার'।"

"বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণ ঠেকাতে গড়ে তোলা হয় 'হলি মেরি ফান্ড'। এরই ধারাবাহিকতায় গোটা খ্রিষ্টান বিশ্ব নানা অজুহাতে ইরাক, ফিলিস্তিন, সর্বশেষ লিবিয়াসহ মুসলিম দেশগুলোকে একের পর এক আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে। 'জাবার আল তারেক' অর্থাৎ তারেকের পাহাড় সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে ৭১১ সালে উমাইয়া শাসনামলে মুসলমানেরা তারেক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে ভূমধ্যসাগরের উত্তর তীরস্থ স্পেনকে রক্ষা করেছিলো রডারিকের দুঃশাসন থেকে। আজ মুসলিমবিদ্বেষী ইউরোপিয়ানরা তার নাম বদলে রেখেছে 'জিব্রাল্টার'।"

মূল ব্যাপার হচ্ছে, মুসলমানরা যে কুরআনকে বুকে ধারণ করে বিশ্ব শাসন করেছিল সেই কুরআনকেই আজকের মুসলমানেরা ঐচ্ছিক হিসেবে ধরে নিয়েছে। আর এ কারণেই মুসলমানদের এই দুর্দশা। মহান আল্লাহ সূরা আল বাকারার ৮৫ নং আয়াতে বলেছেন, "তাহলে কি তোমরা কিতাবের একটি অংশের ওপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশের বিরুদ্ধাচরণ করছো? তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এমনটি করবে তাদের শাস্তি এছাড়া আর কী হতে পারে যে, তারা দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং আখিরাতে তাদেরকে কঠিনতর শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন নন।"

শেষ করছি ব্রিটিশ কলোনাইজের সাবেক মন্ত্রী গ্লাগস্টোনের একটি কথা দিয়ে, তিনি বলেছিলেন- "মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার দুইটি প্রক্রিয়া রয়েছে- ১. তাদের নিকট থেকে কুরআনকে কেড়ে নিতে হবে কিন্তু তা সম্ভব নয়, ২. তারা যেন কুরআনের প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে সেই কাজ করতে হবে কৌশলে, আর তা হবে বেশি কার্যকরী।"

বর্তমান বিশ্বে গ্লাগস্টোনের এই নীতিই কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। আমরা যদি এখনই সচেতন হতে না পারি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সর্বত্রই যে স্পেনের ভাগ্য বরণ করতে হতে পারে এটা অনেকটা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. তাফহীমুল কুরআন
২. লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি- ফিরাস আল খতিব, অনুবাদ- আলী আহমাদ মাবরুর
৩. উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস- ড. এম আব্দুল কাদের ও ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান
৪. বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও খবর

লেখক : আইনজীবী, জজ কোর্ট, ঢাকা।
adv.abutaher@gmail.com

আদর্শ শ্রমনীতি বাস্তবায়নের কৌশল ও পদ্ধতি

লস্কর মোহাম্মদ তসলিম

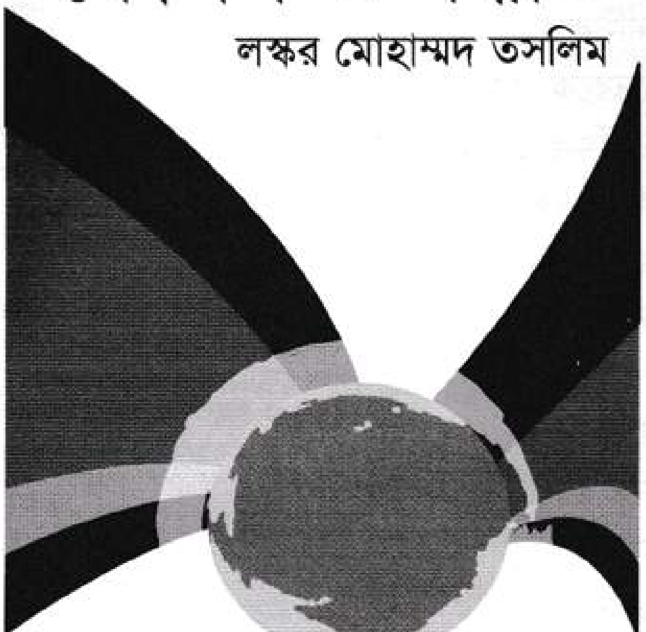

পূর্বের সংখ্যার পর

নিয়মিত কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক শ্রমিক সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট সময়ে ইসলামী শ্রমনীতির দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে এক জায়গায় জমায়েত হওয়ার মাধ্যমে ইসলামী শ্রমনীতির জ্ঞানার্জন ছাড়াও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। সপ্তাহে প্রতিটি কর্মী যতজন শ্রমিকের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ফেডারেশনের দাওয়াত পৌঁছায় তাদেরকে এ সভায় দাওয়াত দিতে হয়। এ সভাগুলো হচ্ছে প্রচারধর্মী। এগুলো সমষ্টিগতভাবে প্রাথমিক দাওয়াতি কাজ করার ফোরাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও সভায় বক্তৃতা ও কুরআনের অংশবিশেষ অর্থসহ পেশ করার মাধ্যমে কর্মীদের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। সাপ্তাহিক শ্রমিক সভায় কর্মসূচি নিম্নরূপ হওয়া উচিত : অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত, শ্রমসমস্যা সম্ভাবনা বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা, সভাপতির ভাষণ/বক্তব্য। মাসিক শ্রমিক সভা– প্রতি মাসে একটি করে মাসিক শ্রমিক সভার আয়োজন করাও আমাদের নিয়মিত দাওয়াতি কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। ফেডারেশনের কোন দায়িত্বশীল, অভিজ্ঞ যে কোন কর্মী বা ব্যক্তি, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর এতে আলোচনা পেশ করবেন। এর কার্যসূচি হবে নিম্নরূপ : ব্যাখ্যাসহ কুরআন তেলাওয়াত, নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বক্তৃতা, ফেডারেশনের পরিচয় পেশ, সভাপতির বক্তব্য, পরিচিতি, শ্রমিক বার্তা, অন্যান্য প্রকাশনী বিক্রয় ও বিতরণ। এ সভায় বেশিসংখ্যক নতুন শ্রমিক উপস্থিত করার চেষ্টা করা প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব।

শ্রমিক সমস্যা নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক: উর্ধ্বতন ফেডারেশনের অনুমতিক্রমে কোনো উপলক্ষকে সামনে রেখে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা যেতে পারে। কোনো হলে বা অডিটোরিয়ামে যে কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশিষ্ট বক্তাদের দ্বারা বক্তৃতার আয়োজন করা যেতে পারে। বৈঠককে আকর্ষণীয় ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। এতে শ্রমিক ছাড়াও উৎসাহী যেকোন ব্যক্তিই থাকতে পারেন। গোলটেবিলের কার্যসূচি সাধারণত নিম্নরূপ:
ব্যাখ্যাসহ কুরআন তেলাওয়াত, নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, ফেডারেশনের পরিচয়, সভাপতির ভাষণ।

সেমিনার: কেন্দ্রীয় ফেডারেশনের অনুমতি/পরামর্শক্রমে বছরে একবার অথবা দুইবার উপযুক্ত পরিবেশ ও সময়ে ইসলামী শ্রমনীতি, রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর জীবন, বিভিন্ন, শ্রমিক সমস্যার ইসলামী সমাধান ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সেমিনার করা যেতে পারে। একটি বিষয়ের বিভিন্ন দিকের ওপর কয়েকজন বক্তা এসে বক্তৃতা করবেন। এ জন্য চিন্তাশীল ও সুযোগ্য বক্তা প্রয়োজন। সেমিনারে এক বা একাধিক অধিবেশন হতে পারে। ইসলামী শ্রমনীতিতে প্রজ্ঞাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে সভাপতি মনোনীত করতে হবে।

চা-চক্র, ফলচক্র, সামষ্টিক ভোজ, ইফতারচক্র, ঈদপুনর্মিলনী: শ্রমিক দাওয়াতি কাজের জন্য এটা একটা আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম। অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য ও আনন্দঘন পরিবেশে শ্রমিকের কাছে আদর্শের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়। টার্গেটকৃত শ্রমিকদেরকে এতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমন্ত্রিতদের কেউ আগ্রহ করে চাঁদা দিতে চাইলে নেয়া যেতে পারে। চক্রের জন্য নিরিবিলি কোন জায়গা বেছে নেয়া প্রয়োজন। স্মরণ রাখতে হবে নতুন শ্রমিকদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই চক্রের আয়োজন করা হয়। ফেডারেশনের উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল ব্যক্তির আগমন উপলক্ষেও বিভিন্ন চক্রের আয়োজন করা যেতে পারে। অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং জেডিএল কর্মকর্তাদেরকেও এরূপ চক্রে দাওয়াত দেয়া যেতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে যেন পরিবেশ গুরুগম্ভীর হয়ে না পড়ে অথবা মাত্রারিক্ত হালকা না হয়। চা-চক্রের কার্যসূচি নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়
কুরআন তেলাওয়াতে, পারস্পরিক পরিচয়, কবিতা আবৃত্তি, হামদ, নাত, প্রশ্নোত্তর, সভাপতির বক্তব্য, আপ্যায়ন, সমাপ্তি ঘোষণা, বনভোজন, সম্মিলিত ভ্রমণ, শিক্ষণীয় কোন ঘটনার উল্লেখ ইত্যাদি।

বনভোজন: শ্রমিকদের জীবনের একঘেয়েমি দূর করার জন্য এ ধরনের কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বনভোজনে আনন্দ লাভের সাথে সাথে ইসলামী পরিবেশও উপভোগ করা যায়। বনভোজনের জন্য শহরের উপকণ্ঠে অথবা ঐতিহাসিক কোন স্থানে যাওয়ার প্রোগ্রাম নিতে হবে। পূর্বাহ্নেই বনভোজনের তারিখ, বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব বণ্টন, চাঁদার হার, একত্রিত হওয়ার সময় ও স্থান, রওয়ানা হওয়ার সময় ইত্যাদি নির্ধারণ করে নিতে হবে। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে কর্মসূচি জানিয়ে দিতে হবে। কর্মসূচির মধ্যে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, রশি টানাটানি, সাঁতার কাটা, গ্রুপ ভ্রমণ, বিভিন্ন শিক্ষামূলক আসর থাকবে। মনে রাখতে হবে উদ্যোক্তাদের যোগ্যতার মাধ্যমে পরিবেশকে আনন্দময় সুশৃঙ্খল এবং শিক্ষামূলক করে তোলার ওপরেই প্রোগ্রামের সাফল্য নির্ভর করে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, কুইজ ও সাধারণ জ্ঞানের আসর, শ্রমিকদের প্রতিভা বিকাশের জন্য এসব প্রোগ্রাম নিতে হয়। আকর্ষণীয় বিষয়বস্তুর ওপর প্রতিযোগিতা রাখতে হবে। প্রতিযোগিতায় পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকাটা উত্তম। প্রতিযোগিতার নিয়ম-কানুন পূর্বেই জানিয়ে দিতে হবে।

পোস্টারিং, দেয়াল লিখন, পরিচিতি ও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রকাশনা বিতরণ: সময় সময় শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও উপলক্ষকে কেন্দ্র করে পোস্টারিং ও দেয়াল লিখন হতে পারে। এসব পোস্টারিং ও দেয়াল লিখন সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে লেখা প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়

শ্রমিকদের উদ্দেশে অভিনন্দনপত্র এবং পরিচিতি প্রভৃতি বিতরণ করা প্রয়োজন। মাঝে মাঝে গ্রুপে সমষ্টিগত শ্রমিক সাক্ষাতের সময় পরিচিতি ও সচেতনতামূলক প্রকাশনী বিতরণ করা যেতে পারে। শুভাকাঙ্ক্ষী, উপদেষ্টা ও বুদ্ধিজীবী মহলেও পরিচিতি, শ্রমিকবার্তা পৌছান দরকার। ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বিভিন্ন সময় সাময়িকী স্মারক ও পত্রিকা প্রকাশ এবং সুষ্ঠু বিতরণের মাধ্যমেও শ্রমিকদের কাছাকাছি পৌছা যায়। তবে এ ধরনের কিছু প্রকাশ করতে হলে ফেডারেশন বা ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংগঠনের অনুমোদন প্রয়োজন। এ ছাড়াও প্রাথমিক কর্মসূচিসমূহ

গ্রুপভিত্তিক কাজ: শ্রমিক ইউনিটসমূহে গ্রুপভিত্তিক কাজ পরিচালিত হবে। এসব গ্রুপে কমপক্ষে একজন থাকবেন যিনি আদর্শের আলোকে শ্রমিকদের নিকট গ্রহণযোগ্য উপায়ে আদর্শ শ্রমনীতি তথা ফেডারেশন/ ইউনিয়নের আহ্বান পৌছাতে সক্ষম হবেন।

গ্রুপ প্রেরণ: ট্রেড ইউনিয়ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শ্রমিক এলাকায়/পেশায়/শিল্প কারখানায় সুবিধাজনক সময়ে এক বা একাধিক পেশাভিত্তিক শ্রমিক গ্রুপ প্রেরণ করতে হবে। যে এলাকায় গ্রুপ প্রেরণ করা হবে পূর্বেই তাদের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে।

শ্রমিক যোগাযোগ সপ্তাহ ও পক্ষ: বছরের সুবিধাজনক সময়ে ইউনিয়নের কেন্দ্র/কার্যকরী পরিষদের পক্ষ থেকে এই সপ্তাহ বা পক্ষ ঘোষিত হয়। একযোগে অথবা পৃথকভাবে সকল ট্রেড পেশায় পূর্ব-পরিকল্পিত উপায়ে এই সপ্তাহ বা পক্ষ পালন করা যেতে পারে কোন ট্রেড নির্দিষ্ট সময়ে সপ্তাহ পালনে অপারগ হলে অনুমতি নিয়ে সুবিধাজনক সময়ে এ কর্মসূচি পালন করতে পারে। এ সপ্তাহে এলাকার সকল শ্রমিকের কাছে পৌছানোর পরিকল্পনা নিতে হবে। সপ্তাহ উপলক্ষে ট্রেড/শাখাসমূহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করবে। সাধারণ শ্রমিক ও উপদেষ্টাদের মাঝে বিতরণ করবে।

মহিলা শ্রমিকদের মাঝে কাজ: আদর্শ শ্রমনী-তির আন্দোলনের কাজকে মজবুত করার লক্ষ্যে শ্রমিককর্মী ভাইয়েরা তাদের মা- বোন এবং অন্যান্য মোহররমা আত্মীয়দের মাঝে এবং শ্রমিক মহিলা বিভাগ পরিকল্পিত উপায়ে নারীশ্রমিকদের মাঝে কাজ করবেন। মহিলা/মোহররমাদের মাঝে কাজের রিপোর্ট আলাদাভাবে প্রদান করতে হবে।

নির্বাচনী কেন্দ্রভিত্তিক শ্রমিকদের কাজের কৌশল ও পদ্ধতি: ট্রেড ইউনিয়ন, সিবিএ, জাতীয়, স্থানীয়, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ট্রেডপেশার শাখা বা উপশাখাসমূহ নির্বাচনী কাজ করবে। পত্রিকা পাঠ, বই, পুস্তিকা ম্যানুফেস্টো পাঠ ও বিতরণ, নির্বাচনে কোরআন হাদিসের আলোকে সাধারণ শ্রমিক ভোটারের দায়িত্ব, বিভিন্ন নির্বাচনী কর্মসূচি পালন ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলে ট্রেড পেশাভিত্তিক নির্বাচনী কাজকে ফলপ্রসূ করা যেতে পারে। সাধারণ শ্রমিক ভোটারদের তালিকা করে পেশাভিত্তিক শ্রমিক ইউনিয়নের কাছে রাখতে চেষ্টা করবেন ও নিয়মিত ভোটারদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করবেন। এ ছাড়া যে কোন পরিস্থিতেই মিল কারখানা গ্যারেজ শ্রমপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক অনুষ্ঠানে শ্রমিকদের যোগ দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এতে করে উক্ত কর্মীর পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে এবং আদর্শিক ফেডারেশন বা ইউনিয়ন সম্পর্কে সাধারণ শ্রমিকদের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন জগতে যোগ্যতা কৌশলে শ্রমিকদের শীর্ষ স্থানীয় হতে হবে। এ জন্য বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভাসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হবে। সাধারণ শ্রমিক ভোটাদের তালিকা সংগ্রহ করে পেশাভিত্তিক শ্রমিক ইউনিটের মাঝে ভাগ করে নিতে হবে।

মানুষ দাসপ্রথার মানসিকতায় শ্রমিক কর্মচারীদেরকে হেয় মনে করে থাকে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের নেতাকর্মীদেরকে সকল মানুষ ভাই ভাই এক আদমের সন্তান এই নীতিতে সকল শ্রমিকদের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। রাসূলে করিম (সা.) নবুওয়তের আগে সমাজসেবক ছিলেন, আমাদেরকেও শ্রমিকদের যাবতীয় ন্যায়সঙ্গত সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে আমরা সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই। আমরা শ্রমিকদের সমস্যাকে দু'ভাবে ভাগ করতে পারি : (ক) ব্যক্তিগত (খ) সমষ্টিগত।

"মানুষ দাসপ্রথার মানসিকতায় শ্রমিক কর্মচারীদেরকে হেয় মনে করে থাকে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের নেতাকর্মীদেরকে সকল মানুষ ভাই ভাই এক আদমের সন্তান এই নীতিতে সকল শ্রমিকদের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। রাসূলে করিম (সা.) নবুওয়তের আগে সমাজসেবক ছিলেন, আমাদেরকেও শ্রমিকদের যাবতীয় ন্যায়সঙ্গত সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে আমরা সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই।"

ব্যক্তিগত সমস্যা

ব্যক্তিগত সমস্যার যেগুলো বেশির ভাগ অর্থনৈতিক, সেগুলো সমাধানের জন্য স্বাবলম্বী পন্থা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ নিজেরাই এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। শ্রমিকদের কাজ না থাকা, বেতন বা মজুরি না পাওয়া ও কর্মে অক্ষমতা, পরিবার চালাতে অসামর্থ্য হওয়া ইত্যাদি দূরীকরণার্থে সামর্থ্য অনুযায়ী নিম্নোক্ত কাজ করা যেতে পারে: কাজ যোগাড় করে দেয়া, অসহায় সাহায্য তহবিল প্রতিষ্ঠা করা, সাধ্যমত নিয়মিত সাহায্য চালু করা, বিনামূল্যে/নামমাত্র দামে খাদ্যসামগ্রী বিলি, ইফতার সামগ্রী, ঈদসামগ্রী, কোরবানির

গোশত বিতরণ করা, গরিব শ্রমিকদেরকে স্বাবলম্বী করতে, তহবিল গঠন করে পরিকল্পিত কাজ করা।

কর্জে হাসানা চালু করা : এই মহৎ কাজের জন্য প্রত্যেক জনশক্তি কমপক্ষে ৩-৫ জন ধনী দানশিল সুধী উপদেষ্টা খুঁজে বের করতে হবে। এভাবে সুধীদের দেয়া সাহায্য ও শ্রমিকদের থেকে সংগ্রহ করা অর্থ দিয়ে তহবিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অর্থ গরিব ও উপযুক্ত শ্রমিকদের দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাহায্য করা হয়, এ জন্য পদ্ধতি তৈরি করে নিতে হবে। শ্রমিক তালিকা, বিতরণ রেজিস্ট্রার রাখতে হবে। তহবিলের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি থাকতে হবে। একজন দায়িত্বশীলের তত্ত্বাবধানে এ তহবিল পরিচালিত হবে। এ তহবিলের জন্য বিভিন্ন সাধারন সুধী ও দাতাদের নিকট থেকেও অর্থ নেয়া যেতে পারে। এজন্য বিশেষ অভিযান চালানো প্রয়োজন।

শ্রমিক শিক্ষা ভাতা : যাকাতের টাকা সংগ্রহ ও বিভিন্ন ধনী ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ করে গরিব ছাত্রদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি বা স্টাইপেন্ডের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। অনেকে আছেন যারা ইউনিয়নের তহবিলে টাকা দিতে রাজি নন। কিন্তু গরিব ছাত্রদের জন্যে টাকা দিতে আগ্রহী, তাদের সাহায্য এ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কর্জে হাসানা : নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় কাউকে বিপদের আর্থিক সাহায্য দেয়ার জন্যে কর্জে হাসানা চালু করা যেতে পারে। এখান থেকে কাউকে কর্জ দিতে হলে লিখিত চুক্তি হয়ে যাওয়া উচিত।

সাংগঠনিক কৌশল ও পদ্ধতি: ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম ইউনিট/শাখা/ট্রেড ইউনিয়ন/ ফেডারেশন/কনফেডারেশন গঠন। বৈঠকাদি পরিচালনা, ক্রমান্বয়ে শ্রমিকের মানোন্নয়নের চেষ্টা, যোগাযোগ, পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে ইউনিয়নের সাংগঠনিক অবস্থান মজবুত করা। যে সব শ্রমিক বা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন আদর্শ শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ নিতে প্রস্তুত তাদেরকে ইউনিট/শাখা/ট্রেড ইউনিয়ন/ফেডারেশন/ কনফেডারেশনের অধীনে সংঘবদ্ধ করা। সংক্ষেপে এ কাজকে আমরা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন বলতে পারি। যে কোন শ্রমিক আন্দোলনেই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রয়োজন। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বা সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া কোন শ্রমিকের অধিকার বা আন্দোলনই সফল হতে পারে না। বিশেষ করে সংঘবদ্ধ জীবন ছাড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে সত্যিকারের মুসলমান থাকাটাই সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন 'তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর এবং

> ব্যক্তিগত সমস্যার যেগুলো বেশির ভাগ অর্থনৈতিক, সেগুলো সমাধানের জন্য স্বাবলম্বী পন্থা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ নিজেরাই এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। শ্রমিকদের কাজ না থাকা, বেতন বা মজুরি না পাওয়া ও কর্মে অক্ষমতা, পরিবার চালাতে অসামর্থ্য হওয়া ইত্যাদি দূরীকরণার্থে সামর্থ্য অনুযায়ী নিম্নোক্ত কাজ করা যেতে পারে: কাজ যোগাড় করে দেয়া, অসহায় সাহায্য তহবিল প্রতিষ্ঠা করা, সাধ্যমত নিয়মিত সাহায্য চালু করা, বিনামূল্যে/নামমাত্র দামে খাদ্যসামগ্রী বিলি, ইফতার সামগ্রী, ঈদসামগ্রী, কোরবানির গোশত বিতরণ করা, গরিব শ্রমিকদেরকে স্বাবলম্বী করতে, তহবিল গঠন করে পরিকল্পিত কাজ করা।

পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।' (সূরা আল ইমরান : ১০২) রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে বের হলো সে ইসলাম থেকে দূরে সরে গেল।' ইসলামী ইতিহাসের গোড়া থেকেই আমরা সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব দেখতে পাই। আজকের এ জুলুম শোষণের পরিবেশে জালিমের সর্বগ্রাসী ও চতুর্মুখী হামলার মোকাবেলায় এর প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুত সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলন হতে পারে না। হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর উদ্ধৃতি এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন 'লা ইসলামা ইল্লা বিল জামায়াত।' অর্থাৎ সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই। আদর্শ শ্রমনীতির যৌক্তিকতা প্রয়োজনীয়তা পেশ করার পর যে সকল শ্রমিক অথবা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন আদর্শ শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ নিতে প্রস্তুত হবে, তাদেরকে ডি-ফরম (ফরম-৫৫) পূরণের মাধ্যমে প্রাথমিক ইউনিট বা স্থায়ী ইউনিট গঠন করতে হবে এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে আবেদনের মাধ্যমে ফেডারেশন বা কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। অন্তর্ভুক্তির পূর্বে আদর্শ শ্রমনীতির আন্দোলনের সংগঠন হিসেবে ফেডারেশনকে অবশ্যই জানাতে হবে বুঝাতে হবে। অর্থাৎ ফেডারেশনের উদ্দেশ্য, কর্মসূচি, কর্মপদ্ধতি ও সংবিধান সম্পর্কে তাদের প্রাথমিক ধারণা দিতে হবে। ফেডারেশনের সদস্যপদ লাভ করতে হলে প্রয়োজন ফেডারেশনকে জানা, বুঝা এবং ঐকান্তিকতার সাথে অংশগ্রহণ করা।

সহযোগী : যে শ্রমিক ডি-ফরম পূরণ করে, কোন ইউনিয়ন বা ফেডারেশন যোগদান করার পর আদর্শ শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার কাজে আগ্রহ প্রকাশ করে তাকে সহযোগী হিসাবে ধরে নিতে পারি।

সক্রিয় সহযোগী : যে সহযোগী আদর্শ শ্রমনী-তির কাজের কমপক্ষে একটি কাজ করবেন তাকে সক্রিয় সহযোগী বলা যেতে পারে।

কর্মী : যে সহযোগী সক্রিয়ভাবে ইউনিয়নের কাজ করেন, সভায় নিয়মিতভাবে যোগদান করেন, ফেডারেশনের তহবিলে চাঁদা দেন এবং ব্যক্তিগত কার্যক্রমের প্রতিবেদন রাখেন শ্রমিক সামাজিক কাজ করেন তাঁকে আমরা শ্রমিক কর্মী বলে থাকি। একজন কর্মী সাধারণত নিম্নলিখিত কাজগুলি করবেন : কুরআন ও হাদীস নিয়মিত বুঝে পড়ার চেষ্টা করবেন, ইসলামী বই পড়বেন, নামাজসহ ইসলামের প্রাথমিক দাবিসমূহ মেনে চলার চেষ্টা করবেন, তহবিলে নিয়মিত চাঁদা দিবেন, নিয়মিত ব্যক্তিগত কার্যক্রম প্রতিবেদন রাখবেন ও দেখাবেন, কর্মীসভা, সাধারণ শ্রমিকসভা প্রভৃতি

অনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করবেন, ফেডারেশন বা ইউনিয়ন কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন, শ্রমিক সেবামূলক কাজ করবেন।

সদস্য : যখন কোন শ্রমিক কর্মী ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন, যখন তিনি তার গোটা সত্তাকে ফেডারেশনের সাথে মিশিয়ে দেন অর্থাৎ সকল শর্তসমূহ যথাযথভাবে পূরণ করেন তখন তাকে 'সদস্য' বলা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ট্রেড ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের কাজের সুবিধা বা কৌশলের জন্যই শ্রমশক্তিকে এরূপ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এটি কোন শ্রেণী বিভাগ নয় বরং আদর্শ কর্মী তৈরির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশল মাত্র।

ট্রেড ইউনিয়ন কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার জন্য বৈঠকাদিমূলক কৌশল ও পদ্ধতি: যে সমস্ত কাজ করতে হবে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

শ্রমিকদের বৈঠকাদি: মাসে একটি বৈঠক করার চেষ্টা করতে হবে। শ্রমিকদের ব্যক্তিগত মান উন্নয়ন এবং ইউনিয়নের সাংগঠনিক উন্নতি ও গতিশীলতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে বৈঠক করতে হয়। বৈঠকের সর্বোচ্চ সময় নির্ধারণ করে নেয়া উচিত।

সংগঠক (সদস্য) বৈঠক: ইউনিয়নসমূহে প্রতি মাসে একবার সংগঠকদের নিয়ে বৈঠক করতে হবে। মাসের শুরুর দিকে বৈঠকগুলো করা উত্তম।

দায়িত্বশীল বৈঠক: ইউনিয়ন/ওয়ার্ড শাখা, থানা/উপজেলা শাখা, জেলা শাখাসমূহ প্রতি মাসে একটি দায়িত্বশীল বৈঠক করতে হবে। দায়িত্বশীল বৈঠকের সময় নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ বৈঠকের কার্যসূচি হতে হবে আদর্শিক ও সাংগঠনিক:

শ্রমিক যোগাযোগ : শ্রমিকদের মধ্যকার "উখওয়াতের "ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গভীর করা, "বুনিয়ানুম মারসুসের" পরিবেশ তৈরিতে একে অন্যকে জানা, নিষ্ক্রিয় শ্রমিক কর্মীকে সক্রিয় করা, সক্রিয় কর্মীকে আরও অগ্রসর করা, ভুল বুঝাবুঝি দূর করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে শ্রমিক যোগাযোগ করতে হয়। ট্রেড ইউনিয়ন/ ফেডারেশনের জন্য যোগাযোগ কার্যক্রম বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। এ জন্য সুনির্দিষ্ট কৌশল পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। নিম্নে কিছু পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো:

(ক) পরিকল্পনা : দিনে, সপ্তাহে বা মাসে কোন্ কোন্ শ্রমিক কর্মীর সাথে যোগাযোগ করা হবে তার পরিকল্পনা থাকতে হবে।

(খ) স্থান ও সময় নির্বাচন : যার সাথে যোগাযোগ করা হবে তিনি কখন সময় দিতে পারেন, আলোচনার জন্য কোন ধরনের স্থান পছন্দ করেন তা জেনে সময় ও স্থান নির্ধারণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, কাউকে কোন কথা বলতে হলে বা কোন কথা শুনতে হলে তিনি যে ধরনের পরিবেশ পছন্দ করেন তা আপনাকে সৃষ্টি করতে হবে।

(গ) ঐকান্তিকতা : যার সাথে যোগাযোগ করা হবে তার ব্যাপারে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে। তিনি যখন বুঝতে পারবেন যে, যোগাযোগকারী তার শুভাকাঙ্ক্ষী তখন তিনি প্রতিটি কথার গুরুত্ব দিবেন। নির্ভেজাল ঐকান্তিকতাই এ ধরনের মানসিকতা সৃষ্টিতে সহায়ক।

(ঘ) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা : প্রথমে তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার প্রতি নজর দিতে হবে। সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে, সম্ভব হলে তা সমাধান করতে হবে। কমপক্ষে সঠিক পরামর্শ দিতে হবে এবং সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রকাশ করতে হবে।

(ঙ) ট্রেড ইউনিয়ন/ ফেডারেশনের সাংগঠনিক আলোচনা : এরপর তার সাথে ট্রেড ইউনিয়ন ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করতে হবে, পরামর্শ চাইতে হবে।

(চ) সার্বিক আন্দোলনের আলোচনা : কর্মীর চিন্তার ব্যাপকতা ও দায়িত্বানুভূতি বৃদ্ধির জন্যে শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

(ছ) সালাম ও দোয়া বিনিময় : পরিশেষে পারস্পরিক সালাম ও দোয়া বিনিময় করে বিদায় নিতে হবে।

সফর : ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের কাজকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে কোন সমস্যা বা জটিলতা দূর করার প্রয়োজনে এবং স্থানীয় কোন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্যে উর্ধ্বতন সংগঠন থেকে অধস্তন শাখাগুলোতে সফর করা হয়। সফরের ব্যয়ভার সফরকৃত শাখাগুলো বা উর্ধ্বতনকেই বহন করতে হয়।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতা/দায়িত্বশীল নির্বাচন : ইউনিয়ন ফেডারেশনের ও সাংগঠনিক স্তর সমূহে গঠনতান্ত্রিক নিয়মে বার্ষিক/দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন করে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য সম্পাদক নির্বাচন করতে হয় এবং নিয়মিত রিটার্ন দাখিল করতে হয়।

পরিকল্পনা : পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করা মজবুত ট্রেড ইউনিয়নের পরিচয়। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সতর্ক নজর রাখতে হবে: শ্রমশক্তি (শ্রেণী বিন্যাসসহ), জনশক্তির মান, কাজের পরিধি ও পরিসংখ্যানমূলক তথ্য, আর্থিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বন্ধু প্রতিপক্ষ শক্তির তৎপরতা। নির্দিষ্ট বৈঠকে পরামর্শক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। মোট কথা পরিকল্পনা প্রণয়নে পরামর্শকে প্রাধান্য দিতে হবে। অধস্তন শাখাগুলো মাসিক, দ্বিমাসিক, ষান্মাসিক, বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

রিপোর্টিং : পরিকল্পনা অনুমোদন হওয়ার পর কাজের সুষ্ঠু পর্যালোচনার জন্যে নিয়মিত রিপোর্ট প্রণয়ন অপরিহার্য। রিপোর্টের উপর সামষ্টিক পর্যালোচনা বাঞ্ছনীয়। অধস্তন সংগঠনগুলো নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন সংগঠনে রিপোর্ট প্রেরণ করবেন। (চলবে)

লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

> ” একজন কর্মী সাধারণত নিম্নলিখিত কাজগুলি করবেন : কুরআন ও হাদীস নিয়মিত বুঝে পড়ার চেষ্টা করবেন, ইসলামী বই পড়বেন, নামাজসহ ইসলামের প্রাথমিক দাবিসমূহ মেনে চলার চেষ্টা করবেন, তহবিলে নিয়মিত চাঁদা দিবেন, নিয়মিত ব্যক্তিগত কার্যক্রম প্রতিবেদন রাখবেন ও দেখাবেন, কর্মীসভা, সাধারণ শ্রমিকসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করবেন, ফেডারেশন বা ইউনিয়ন কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন, শ্রমিক সেবামূলক কাজ করবেন। ”

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস

আতিকুর রহমান

পূর্বের সংখ্যার পর

শ্রমিক শ্রেণীকে সর্বহারা শ্রেণী রূপে আখ্যায়িত করে তারা বলেন যে, পুঁজিপতি শ্রেণীকে উৎখাত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া শ্রমিক শ্রেণী শোষণ থেকে মুক্তি পেতে পারে না। তারা শোষণমুক্ত সমাজকে দুটো পর্বে ভাগ করে প্রথম পর্বের নাম দেন সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং দ্বিতীয় পর্বের নাম কমিউনিস্ট সমাজ। সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুয়ায়ী শ্রম দেবে আর সেই যোগ্যতার ভিত্তিতে পারিশ্রমিক পাবে। কমিউনিস্ট সমাজে প্রত্যেকে দেবে তার সাধ্য অনুসারে, প্রত্যেকে পাবে তার প্রয়োজন অনুসারে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে একটি সুশৃঙ্খল তথা একশিলা ধরনের রাজনৈতিক দলে সংগঠিত হতে হবে বলে তারা মতপ্রকাশ করেন। শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজকে শ্রমিক শ্রেণীর চূড়ান্ত লক্ষ্য বিবেচনা করে তারা এই রাজনৈতিক দলের নাম দিলেন কমিউনিস্ট পার্টি। 'কমিউনিস্ট' একটি ল্যাটিন শব্দ। এই শব্দের অর্থ হলো সার্বজনীন। কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে তারা সর্বপ্রথম তাদের তত্ত্ব প্রাথমিকভাবে উত্থাপন করেন। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' স্লোগানটি এই ইশতেহারে সর্বপ্রথম উত্থাপন করা হয়। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ১৮৩৬ সালে জার্মান প্রবাসী শ্রমিকদের নিয়ে 'সৎ লিগ' নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়। এই সংগঠনটি ছিল শ্রমিকদের চরমপন্থী অংশের একটি গুপ্ত আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং তা অর্ধেক প্রচারমূলক ও অর্ধেক ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কাজ চালাতো। সংগঠনটির লক্ষ্য ছিল সম্পত্তির সাধারণ মালিকানা। বুর্জোয়া শ্রেণীর মনোভাবের পরিবর্তন হয়ে ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবোধ জাগলে এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে এবং তাতে শ্রমিক শ্রেণী দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে পারে বলে এই সংগঠন মনে করতো। 'সকল মানুষ ভাই ভাই' এই ছিল সংগঠনের মূল স্লোগান। মার্কস ও অ্যাঙ্গেলের প্রভাবে এ সংগঠনটি তাদের উদ্ভাবিত তত্ত্ব ত্যাগ করে বৈজ্ঞানিক, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করে এবং সংগঠনের নাম পাল্টিয়ে রাখা হয় 'কমিউনিস্ট লিগ'। কমিউনিস্ট লিগের কর্মসূচি হিসেবে মার্কস ও অ্যাঙ্গেলস ১৮৪৮ সালে ইতিহাসখ্যাত 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' রচনা করেন। দ্রুততার সাথে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়ামসহ ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশে কমিউনিস্ট লিগের শাখা গঠিত হয়। মাত্র চার বছর কাজ করার পর প্রতি বিপ্লবের তীব্র দমননীতির ফলে ১৮৫২ সালে এ সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনের ইতিহাসে পরবর্তীকালে ১৮৬৪ সালের শেষদিকে 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি' নামে সংগঠনটির জন্ম নিঃসন্দেহে ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই সংগঠন মার্কস-অ্যাঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বকে ধারণ করে গঠিত হয়। 'ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল' বা 'প্রথম আন্তর্জাতিক' নামে সুপরিচিত এই সংগঠনটি প্রকৃত অর্থে দুনিয়ার ইতিহাসে শ্রমিকের প্রথম রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক সংগঠন। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা সমাবেশে ইংরেজ, ফরাসি, জার্মানি, ইতালীয়, সুইস ও পোলিস শ্রমিকদের প্রতিনিধিসহ লন্ডনে

১৮২৩ সালে আমেরিকার ইতিহাসে সর্বপ্রম মহিলা শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দেয়। এই মহিলা শ্রমিকরা ছিল নিউ ইয়র্কের দর্জি শ্রমিক। ১৮২৮ সালে সর্বপ্রথম শিল্প ও কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট আন্দোলন শুরু করে। এই ধর্মঘট আন্দোলন ছিল পোশাক কারখানার শ্রমিকদের। ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত মজুরি বৃদ্ধি ও ১০ ঘন্টা শ্রম দিবসের দাবিতে ধর্মঘট আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। এই ৪ বছরে ১৬৮টি ধর্মঘট পালিত হয়। আন্দোলনের ফলে শ্রমিকরা কোথাও কোথাও ১০ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবি আদায় করে নেয়। এই সময়ে সারা দেশে ১৫০টি শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে ওঠে এবং সভ্য সংখ্যা ৩ লাখে পৌছে।

অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের প্রবাসী মার্কস-অ্যাঙ্গেলসের অনুসারী শ্রমিক নেতারা যোগদান করেন। প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন দেশে দেশে শক্তিশালী ও প্রসারিত হতে থাকলে মার্কস ও অ্যাঙ্গেলস আন্তর্জাতিক নেতা হিসাবে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। তাদের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব ও দিকনির্দেশনা দেশে দেশে সাধারণ শ্রমিকরা গ্রহণ করতে থাকে। এই সময় থেকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনের সাথে মার্কস ও অ্যাঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের তত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামই তখন থেকে শ্রমিকদের কাছে মুখ্য হয়ে উঠতে থাকে।

শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রাম হয়ে যায় রাজনৈতিক সংগ্রামের অধীন এক রূপ। মার্কস ও অ্যাঙ্গেলসের তত্ত্ব ও মতামতের বাইরে অন্যান্য মত ও চিন্তাকে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির লক্ষ্য অর্জনের প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা বাড়তে থাকে। এই পটভূমিতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের শ্রমিক শ্রেণী ১৮৭০ সালের ১৮ মার্চ ক্ষমতা দখল করে। ইতিহাস প্যারিসের এই বিপ্লব 'প্যারি কমিউন' হিসেবে সুপরিচিত। ইতিহাসে একে শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতিক্রিয়াশীলদের হটিয়ে দিয়ে ৭১ দিন প্যারিসের শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করে রাখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রবল আক্রমণের মুখে প্যারি কমিউনের পতন ঘটে। এই পতনের ভেতর দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের একটি যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। প্যারি কমিউনের পতনের পর একদিকে দমন-পীড়ন আর অন্য দিকে মতামত ও চিন্তার নানা পার্থক্য প্রথম আন্তর্জাতিককে ইউরোপে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে লন্ডন থেকে ১৮৭২ সালে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় দফতর নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত করা হয়। মূলত ইউরোপের দেশান্তরি শ্রমিকরা আমেরিকায় এ সংগঠনটির হাল ধরেন। এতদসত্ত্বেও সংগঠনটির বিলুপ্তির সময় এক ঘোষণায় বলা হয় যে, অবস্থা উপযোগী হলে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী আবারও একই সংগ্রামের পতাকা তলে একত্র হবে। পরবর্তী সময়ে ১৮৮৯ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে প্যারিসে এক সম্মেলনে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট লিগ ও প্রথম আন্তর্জাতিক ধারাবাহিকতার ভেতর দিয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে ওঠে। শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম ও সংগঠন দুনিয়াব্যাপী মার্কস ও অ্যাঙ্গেলসের তত্ত্বগত চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলেই এ সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়। এই সম্মেলন থেকেই আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিক সংহতি দিবস মে দিবস পালনের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' স্লোগানটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর স্লোগান রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলন: সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকায় প্রাথমিক ধরনের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্কের আবির্ভাব ঘটে। সেই সময়ে ১৬৮৪ সালের দিকে নিউ ইয়র্কে সর্বপ্রথম ঠেলাওয়ালাদের ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। ১৭৬৩ সালে চার্লসটনে চিমনি পরিষ্কারক শ্রমিকরা একত্র হয়ে দাবি-দাওয়া না মানা পর্যন্ত কাজ করবে না বলে ঘোষণা দেয়। ১৭৭০ সালে নিউ ইয়র্কে পিপা প্রস্তুতকারক শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। ১৭৭৮ সালে নিউ ইয়র্কের ছাপাখানার ঠিকা শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে একত্র হয়। মজুরি বেশি থাকার কারণে আমেরিকায় লুডাইট আন্দোলন অথবা তেমন ধরনের কোনো আন্দোলন দেখা দেয়নি। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ধর্মঘট আন্দোলনের সূচনা ঘটে। ১৭৮৬ সালে ফিলাডেলফিয়ার ছাপাখানার ঠিকা শ্রমিকরা সর্বপ্রম তীব্র ধর্মঘট আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায় এবং দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়। ১৭৯০ এর দশকে ধর্মঘট সংগ্রাম ব্যাপকতা লাভ করে। তবে এই ধর্মঘটগুলোতে শিল্প শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করেনি। এগুলো মূলত মুদ্রণশিল্পের ঠিকা শ্রমিক, ছুতার মিস্ত্রি, নাবিক, জাহাজ নির্মাণ শ্রমিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেশ কিছু শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। ১৭৯২ সালে ফিলাডেলফিয়ার জুতা শ্রমিকদের, বাল্টিমোরে দর্জিদের, নিউ ইয়র্কে ছাপা শ্রমিকদের; ১৭৯৬ সালে নিউ ইয়র্কে কাঠমিস্ত্রিদের; ১৮০৩ সালে নিউ ইয়র্কে জাহাজ নির্মাণ ও ছুতার মিস্ত্রিদের ইউনিয়নগুলো উল্লেখযোগ্য।

১৮২৩ সালে আমেরিকার ইতিহাসে সর্বপ্রম মহিলা শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দেয়। এই মহিলা শ্রমিকরা ছিল নিউ ইয়র্কের দর্জি শ্রমিক। ১৮২৮ সালে সর্বপ্রথম শিল্প ও কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট আন্দোলন শুরু করে। এই ধর্মঘট আন্দোলন ছিল পোশাক কারখানার শ্রমিকদের। ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত মজুরি বৃদ্ধি ও ১০ ঘন্টা শ্রম দিবসের দাবিতে ধর্মঘট আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। এই ৪ বছরে ১৬৮টি ধর্মঘট পালিত হয়। আন্দোলনের ফলে শ্রমিকরা কোথাও কোথাও ১০ ঘন্টা শ্রম দিবসের দাবি আদায় করে নেয়। এই সময়ে সারা দেশে ১৫০টি শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে ওঠে এবং সভ্য সংখ্যা ৩ লাখে পৌছে। আমেরিকাতেই ১৮২৭ সালে ফিলাডেলফিয়ার মেকানিকদের ১৫টি শ্রমিক ইউনিয়নের সমন্বয়ে সর্বপ্রম ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গড়ে ওঠে। ১৮৩৪ সালে জাতীয় ভিত্তিতে শ্রমিক ইউনিয়নগুলো ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে 'জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন' গঠিত হয়। এ সংগঠনটি কাজের সময় কমানোর দাবি জোরের সাথে উত্থাপন করে এবং এ দাবির সমর্থনে জনমত ও আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ৩ বছর কাজ করার পর সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটে। ১৮২৮ থেকে ১৮৩৪ সালের মধ্যে আমেরিকার বিভিন্ন শিল্প এলাকায় প্রাথমিক রাজনৈতিক চরিত্রের শ্রমিক শ্রেণীর বিভিন্ন দল গড়ে ওঠে। তবে এসব দলের দাবিও মূলত অর্থনৈতিক ও অধিকার সংক্রান্ত ছিল। ১০ ঘণ্টা শ্রম দিবস আইনের স্বীকৃতি, শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল, নগদ টাকায় বেতন প্রদান প্রভৃতি ধরনের দাবি এই দলগুলো উত্থাপন করে। এসব দল

রাজ্যগুলোর পার্লামেন্ট ও বিভিন্ন স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ১৮২৯ সালে নিউ ইয়র্কের নির্বাচনে শ্রমিকদের এ ধরনের দল শতকরা ২৮ ভাগ ভোট এবং তাদের কয়েকজন প্রার্থী জয়লাভ করে।

১৮৩৬ সালে নিউ ইয়র্কের অগ্রসর চেতনার শ্রমিকরা সেখানকার কৃষক প্রতিনিধিদের সাথে একত্র হয়ে 'ইকুয়াল রাইটস পার্টি গঠন এবং রাজ্যের গভর্নর ও ভাইস গভর্নর পদে প্রার্থী মনোনীত করে। এ সময়েই আমেরিকায় শ্রমিক শ্রেণী ভূমি সংস্কার এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোর আইনগত স্বীকৃতির দাবি জোরেশোরে উত্থাপন করে। তবে প্রাথমিক রাজনৈতিক ধরনের দলগুলো বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর উপরোক্ত ধরনের সচেতনতা ও আন্দোলনগত তৎপরতার ফলে কিছু সংস্কার সাধিত হয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ডেমোক্রেটিক পার্টি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে মজুরি না কমিয়ে ১০ ঘণ্টা শ্রম দিবসসহ শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি মেনে নেয়। ১৮৪২ সালে আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণী ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘট করার আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে ১০ ঘণ্টা শ্রম দিবস আমেরিকার সকল রাজ্যে আইনগত স্বীকৃতি পায়। ১৮৪৮-৪৯ সালে ইউরোপব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনের পরাজয়ের পর ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি শ্রমিক শ্রেণীর ওপর তীব্র দমননীতি ও শ্বেত সন্ত্রাস চালায়। ফলে মার্কস-এঙ্গেলসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট লিগসহ অন্যান্য মতামতের অনেক বিপ্লবী নেতা ও কর্মী আমেরিকা গমন করেন। এদের মধ্যে মার্কস ও এঙ্গেলসের বন্ধু জার্মান বিপ্লবী ফ্রিদরিখ জর্গে ও ইয়োসেফ ভেইদেমেয়ার ছিলেন প্রধান। জর্গে পরবর্তীকালে ১৮৭২ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের সদর দপ্তর নিউ ইয়র্কে স্থানান্তরিত হলে প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রধান হয়েছিলেন। মূলত এসব নেতা ও কর্মীর তৎপরতার ফলেই আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট ধারার সূচনা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশ ঘটার ক্ষেত্রে আমেরিকার নানা ধরনের সমস্যা ও বাধা ছিল। আমেরিকার উত্তরাঞ্চলেই শিল্প ও কল-কারখানা গড়ে উঠেছিল, কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে ছিল দাসপ্রথা। দাস মালিকরা স্বাভাবিকভাবেই শিল্প কল-কারখানা গড়ে ওঠার বিরোধিতা করে। এর পরিণতিতে ১৮৬১ সালে একই দেশের দুই ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এই গৃহযুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৬৫ সালে দাস প্রথানির্ভর দক্ষিণাঞ্চল পরাজয় বরণ করে। শিল্পপ্রধান উত্তরাঞ্চলের এই বিজয়ের ফলে আমেরিকায় পুঁজিবাদী বিকাশের প্রধান বাধা অপসারিত হয়। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ঠিক পূর্বে মুহূর্তে ১৮৬১-৬২ সালে জাতীয় ভিত্তিতে কয়েকটি শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। এগুলোর মধ্যে ঢালাই শ্রমিক, মেশিন নির্মাতা শ্রমিক ও কর্মকারদের ইউনিয়নগুলোই ছিল প্রধান। গৃহযুদ্ধের সময়ে জাতীয় ভিত্তিতে গঠিত এই ইউনিয়নগুলোর বিলুপ্তি ঘটে। গৃহযুদ্ধ শুরুর আগে ১৮৬০ সালের ৮ মার্চ আমেরিকার নারী শ্রমিকরা একত্র হয়ে নারী শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করে। নারী শ্রমিকদের ওপর বাড়তি শোষণ ও নির্যাতনের ফলেই তারা স্বতন্ত্রভাবে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ৮ মার্চ দিনটিই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্বীকৃতি লাভ করে। গৃহযুদ্ধ শেষ হবার ঠিক পরেই কয়েকটি স্থানীয় শ্রমিক সংগঠন জাতীয় পর্যায়ে মিলিত হয়ে একটি ফেডারেশন গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৮৬৬ সালের ২২ আগস্ট ৬০টি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ৬০ হাজার সংগঠিত শ্রমিক প্রতিনিধিকে নিয়ে বালটিমোর শহরে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন' নামে একটি ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। লোহা ঢালাই শ্রমিকদের তরুণ নেতা উইলিয়াম এইচ সিলভিস জাতীয় ভিত্তিতে এই সংগঠনটি গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি এ সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। লোহা ঢালাই কারখানার শ্রমিক সিলভিস আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের

"

কার্ল মার্কসের নেতৃত্বে প্রথম আন্তর্জাতিক ও ইউরোপের বিভিন্ন মতামতের শ্রমিক সংগঠনগুলো প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের দাবির প্রতি সর্মথন ঘোষণা করে। ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন প্রস্তাবটি গ্রহণ করার ১ মাস পর ১৮৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসে এই দাবির সমর্থনে প্রস্তাব পাস করা হয়। ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন প্রচার ও আন্দোলনের ফলে আমেরিকার বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল '৮ ঘণ্টা শ্রম সমিতি' স্থাপিত হয়।

"

ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি স্বশিক্ষিত শ্রমিক ও স্বাভাবিক সহজাত সংগঠক হিসেবে বিশেষভাবে সুপরিচিত ছিলেন। তার নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন' সংগঠনই সর্বপ্রথম আমেরিকাতে ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবি উত্থাপন এবং দাবির সমর্থনে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব ও উদ্যোগ গ্রহণ করে।

কার্ল মার্কসের নেতৃত্বে প্রথম আন্তর্জাতিক ও ইউরোপের বিভিন্ন মতামতের শ্রমিক সংগঠনগুলো প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের দাবির প্রতি সর্মথন ঘোষণা করে। ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন প্রস্তাবটি গ্রহণ করার ১ মাস পর ১৮৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসে এই দাবির সমর্থনে প্রস্তাব পাস করা হয়। ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন প্রচার ও আন্দোলনের ফলে আমেরিকার বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল '৮ ঘণ্টা শ্রম সমিতি' স্থাপিত হয়। এই আন্দোলন ব্যাপক ও তীব্র হলে আমেরিকার অনেক রাজ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৮ ঘণ্টা কাজের দিনের দাবি মেনে নেয়া হয়। ১৮৬৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা এই মর্মে একটি আইন পাস করে। কিন্তু ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের নেতৃত্বে আন্দোলন দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। কেননা ১৮৬৯ সালের দিকে আমেরিকার শ্রমিকদের প্রিয় নেতা সিলভিস ৪১ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এর কিছুদিন পরেই সংগঠনটি লোপ পায়।

১৮৭০ এর দশকে আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে কয়েকটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। ১৮৭৪ সালে নিউ ইয়র্কের টমকিন স্কোয়ারে এক শ্রমিক জনসভায় পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ১৮৭৫ সালে পেনসিলভানিয়া অঞ্চলের কয়লা খনি মালিকরা খনি অঞ্চল থেকে জোর করে খনি শ্রমিকদের সংগঠন উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে। এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা রুখে দাঁড়ায়। আন্দোলনকারী ১০ জন খনি শ্রমিককে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো হয়। এ ঘটনার পটভূমিতে ১৮৭৭ সালে রেল ও ইস্পাত কর্পোরেশনের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের ধর্মঘট সংগ্রাম সংঘটিত হয়। কর্তৃপক্ষ ধর্মঘট আন্দোলনের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী নামায়। ধর্মঘটী শ্রমিকরা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালায়। এই সংগ্রাম

> শিকাগো অঞ্চলের এক লাখ পঁচাশি হাজার শ্রমিক বিশেষ করে রাজমিস্ত্রিরা ৮ ঘণ্টা কাজের দিনের দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়। একদিকে পুঁজিপতি ও সরকার নাইটস অব লেবার সংগঠনটির সুবিধাবাদী নেতাদের দিয়ে শ্রমিক ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে আন্দোলনকে বানচাল করার চক্রান্ত করে; অন্যদিকে শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখে।

প্রচণ্ড দমননীতি ও আক্রমণের মুখে পরাজয় বরণ করে। কিন্তু এসব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবির আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়। এ সময়ে এক সাংবাদিক এ দাবি প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তার নাম জন সুইনটন। তিনি একটি সাপ্তাহিক বের করেন। একে 'সুইনটনের কাগজ' বলা হতো। এ পত্রিকায় ৮ ঘণ্টা আন্দোলনের অগ্রগতি তুলে ধরার জন্য একটি নিয়মিত বিভাগ খোলা হয়। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার' নামে একটি সংগঠন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৮৮৪ সালের ৭ অক্টোবর ওই সংগঠনের চতুর্থ সম্মেলনে ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় সংগঠিত ট্রেড ও লেবার ইউনিয়নের ফেডারেশন এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে যে, ১৮৮৬ সালের ১ মে তারিখ থেকে দৈনিক ৮ ঘণ্টাকেই কাজের দিন বলে আইনত গণ্য করা হবে। এই সাথে আমরা সকল শ্রমিক সংগঠনের কাছে সুপারিশ করছি যে, তারা যেন উপরোক্ত তারিখের মধ্যে এই সিদ্ধান্তের সাথে খাপ খাইয়ে নিজ নিজ এলাকায় আন্দোলন পরিচালনা করে।" প্রস্তাবটি গ্রহণ করার পর ফেডারেশন বুঝতে পারলো যে, সকল শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ করা ছাড়া লড়াইয়ে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। তাই তারা অপর একটি সংগঠন 'নাইটস অব লেবার'কে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। নাইটস অব লেবার সংগঠনটি আমেরিকার ফেডারেশন অব লেবারের চাইতে অনেক বড় সংগঠন ছিল। পরবর্তী সময়ে এ সংগঠনটি ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবিতে ধর্মঘট আন্দোলনের বিরোধিতা করে। ফলে শ্রমিকদের কাছ থেকে এই সংগঠনটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণী যখন জাতীয় ভিত্তিতে একটি মাত্র স্লোগান সংগঠিত হচ্ছে; তখন আমেরিকার নানা অঞ্চলে, কল-কারখানায় ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিসহ অন্যান্য দাবিতে ধর্মঘট আন্দোলন ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করে। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ৫০০ ধর্মঘট ও তালাবদ্ধ আন্দোলন হয়। এগুলোতে গড়ে দেড় লাখ শ্রমিক যোগ দেয়। ১৮৮৫ সালে ধর্মঘট ও তালাবদ্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৭০০ হয় এবং তাতে যোগাদানকারী শ্রমিকদের সংখ্যা দাঁড়ায় আড়াই লাখে। ১৮৮৫ সালেই ২৪৬৭টি প্রতিষ্ঠান ধর্মঘট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। ১৮৮৬ সালে ধর্মঘট ও তালাবদ্ধের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৭২টিতে অর্থাৎ আগের বছরের দ্বিগুণেরও বেশি। আন্দোলনে যোগদানকারী শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ লাখে এবং ১১৫৬২টি প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। তবে এই ধর্মঘটগুলো শিকাগোর শ্রমিক অঞ্চলেই সবচাইতে তীব্রতা ও ব্যাপকতা লাভ করে। তাছাড়া নিউ ইয়র্ক, বালটিমোর, ওয়াশিংটন, সিনসিনাটি, সেন্ট লুই, পিটসবুর্গ, ডেট্রয়েট প্রভৃতি শহরে ও শিল্পাঞ্চলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এসব ধর্মঘটের মূল স্লোগান ছিল ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবস। ৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম, ৮ ঘণ্টা বিনোদন-এভাবে ২৪ ঘণ্টাকে সমানভাবে ভাগ করে নেয়া হয়। ক্রমেই এই যুক্তিসংগত ও মানবিক দাবি অসম্ভব রকমের জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কোনো কোনো কারখানার শ্রমিকরা নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি আদায় করে নিতে সক্ষম হয়। ৮ ঘণ্টা কাজের দাবির জনপ্রিয়তা অনুমান করা যাবে নিম্নলিখিত ঘটনায়। যে সব জুতা কারখানায় ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি আদায় হয়ে গেছে, শ্রমিকরা সেসব জুতার নাম দিল '৮ ঘণ্টা জুতা'। সিগারেট কারখানায় দাবি মেনে নিলে তার নাম হলো '৮ ঘণ্টা চুরুট' ইত্যাদি। এভাবে সর্বত্র '৮ ঘণ্টার উন্মাদনা' সারা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে?

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের ইতিহাসঃ ১৮৮৬ সালের ১ মে ছিল শনিবার, স্বাভাবিক কাজের দিন। তা সত্ত্বেও ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবস আইনত চালু করার দাবিতে আমেরিকার সকল শিল্পাঞ্চলে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ১ মের কিছু দিন আগে 'নাইটস অব লেবার' সংগঠনটি ধর্মঘট বানচাল করতে চাইলেও সাধারণভাবে সকল শ্রমিক এ ধর্মঘট আন্দোলনে সরাসরিভাবে অংশগ্রহণ করে। এ ধর্মঘট আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল শিকাগো। শিকাগোর শিল্পাঞ্চলের ইউনিয়নগুলোতে বামপন্থীদের প্রভাব ছিল। এ কারণে শিকাগোতে ধর্মঘট খুবই জঙ্গিরূপ ধারণ করে। ১ মের অনেকদিন আগে থেকেই শিকাগোর শ্রমিকরা এ ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সেখানে সকল শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে '৮ ঘণ্টা শ্রম সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮ ঘণ্টা শ্রম সমিতি ধর্মঘটের প্রস্তুতিমূলক কাজ ছাড়াও প্রত্যেক ইউনিয়নকে অর্থ সংগ্রহ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে। কেননা ধর্মঘট করার ফলে অনেক শ্রমিকই কর্মচ্যুত হতে পারে, এ ধারণা আগে থেকেই আঁচ করা গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রম সমিতিগুলো ছিল শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ মোর্চার প্রতীক। ফেডারেশন অব লেবার, নাইটস অব লেবার এবং আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম স্বতন্ত্র ও সংগঠিত সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল 'সোশ্যালিস্ট লেবার পার্টি' প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমিতি গড়ে তুলেছিল। তাছাড়া তখন আমেরিকাতে সকল বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের সমবায়ে 'সেন্ট্রাল লেবার ইউনিয়ন' নামে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল। এ সংগঠনটিও ৮ ঘণ্টা শ্রম সমিতিকে সমর্থন জানায়। সেন্ট্রাল লেবার ইউনিয়ন ১ মে তারিখের আগের রোববার ১ মে ধর্মঘট সফল করার জন্য শিকাগো শহরে একটি শ্রমিক সমাবেশের আয়োজন করে। এই সমাবেশে ২৫ হাজার শ্রমিক যোগ দেন। ১ মে শিকাগোর শ্রমিক অঞ্চলগুলোতে ধর্মঘট সার্বিকভাবে সফল হয়। শিকাগোকে কেন্দ্র করে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ শ্রমিক কাজ বন্ধ রাখে। সকাল থেকেই শ্রমিকরা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মিশিগান অ্যাভিনিউয়ের মিছিলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। শিকাগোর পুঁজিপতি মালিকরা এবং কর্তৃপক্ষ এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। দমনমূলক নীতি চালিয়ে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তথাকথিত নাগরিক কমিটি সারাদিন ধরে সভা চালায়। এ কমিটির নির্দেশে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার অযুহাতে শহরের অলিগলি ও বিশেষ বিশেষ বাড়ির ছাদে পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী জড়ো করা হয়। এসব উসকানির মুখে শিকাগোর শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট ও মিছিল করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। সব কিছু উপেক্ষা করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মিশিগান অ্যাভিনিউর চত্বরে জমায়েত হয়। গগনবিদারী স্লোগানে মুখরিত হয়ে মিছিল লেক ফ্রন্টে গিয়ে শেষ হলে শ্রমিক নেতারা সেখানে বক্তৃতা করেন। ইংরেজি, জার্মান, পোলিস প্রভৃতি ভাষায় নেতারা বক্তৃতা দেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য সংহতি বজায় রেখে ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবিতে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করা হয়। শান্তিপূর্ণভাবে ও

সাফল্যের সাথে ১ মের কর্মসূচি পালন শ্রমিক শ্রেণীকে সংগ্রামের নব প্রেরণায় উজ্জীবিত করে।

শিকাগো অঞ্চলের এক লাখ পঁচাশি হাজার শ্রমিক বিশেষ করে রাজমিস্ত্রিরা ৮ ঘণ্টা কাজের দিনের দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়। একদিকে পুঁজিপতি ও সরকার নাইটস অব লেবার সংগঠনটির সুবিধাবাদী নেতাদের দিয়ে শ্রমিক ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে আন্দোলনকে বানচাল করার চক্রান্ত করে; অন্যদিকে শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখে। কিন্তু বিরুদ্ধপক্ষ কিছু একটা করার হীন প্রচেষ্টায় উন্মুখ হয়ে ওঠে। ৩ মে তারিখে ম্যাককর্মিক ফসল কাটার কারখানায় এক সভা চলার সময়ে শ্রমিকরা প্রথমে মালিকদের লেলিয়ে দেয়া দালালদের ডাণ্ডাবাজির মোকাবিলা করে। কিন্তু এর পর মুহূর্তেই অতর্কিতে শ্রমিক সভায় পুলিশ জানোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশের গুলিতে ৬ জন ঘটনাস্থলেই নিহত এবং বেশ কিছু আহত হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড যেখানে সংঘটিত হয়, তার কাছেই কাঠ চোরাই শ্রমিকদের এক সভা চলছিল। সেই সভায় শিকাগোর শ্রমিকদের অন্যতম প্রিয় নেতা স্পাইজ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। গুলিবর্ষণের খবর পেয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সাথে সাথেই স্পাইজ এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ৪ মে হে মার্কেটে এক প্রতিবাদ সভার আহবান করেন। ৪ মে মঙ্গলবার হে মার্কেট স্কোয়ারে এক বিরাট শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের কাছেই কর্তৃপক্ষ প্রচুর সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করে। শ্রমিক নেতা স্পাইজ বক্তৃতা করার পর পার্সনস রাত দশটা পর্যন্ত দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শেষ বক্তা সাম ফিলডেন বক্তৃতা শেষ করেছেন, শ্রমিক জনতা সভা থেকে উঠে যাচ্ছেন, ঠিক এমনি সময়ে ওয়ার্ড নামে এক ক্যাপ্টেন বক্তৃতা মঞ্চের সামনে এসে নির্দেশ দিনেল, 'ইলিনয় রাজ্যের জনগণের নামে আমি অবিলম্বে ও শান্তিপূর্ণভাবে এই সভা বন্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছি।' শ্রমিক নেতা ফিলডেন 'আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবেই আছি' দৃঢ়ভাবে কথাটি শেষ করতে না করতেই একটি বোমার বিকট আওয়াজে আকাশ-বাতাশ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। আন্দোলনকে সাবোটাজ করার উদ্দেশ্যে অজ্ঞাত বেশে পুলিশের এক এজেন্ট বোমাটি নিক্ষেপ করে। বোমাটি বিস্ফোরিত হওয়ার সাথে সাথেই সুযোগের অপেক্ষায় অবস্থানরত সশস্ত্র বাহিনী শ্রমিক-জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নির্বিচারে লাঠি ও গুলি চালানো হয়। ঘটনাস্থলে ৪ জন শ্রমিক নিহত ও বহু সংখ্যক আহত হলো। কিন্তু পুলিশও রেহাই পাইনি। এ ঘটনায় ৭ পুলিশ নিহত হয়। হে মার্কেটের চত্বর রক্তের বন্যায় প্লাবিত হয়ে যায়। ইতিহাসে এ ঘটনা 'হে মার্কেটের ঘটনা' বলে পরিচিত। এ ঘটনাই মে দিবসের ঐতিহাসিক ঘটনা-যা আজও সমগ্র দুনিয়ার শ্রমিক, শ্রমজীবী ও গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল জনগণকে আন্তর্জাতিক সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব বোধে একত্র করে। হে মার্কেটের রক্তক্ষয়ী ঘটনার সময়েই ঘটনাস্থল থেকে স্পাইজ ও ফিলডেন গ্রেফতার হন। কিন্তু অন্যান্য নেতা আত্মগোপনে চলে যান। শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুঁজিপতি শ্রেণী ও সরকার সার্বিক জেহাদ ঘোষণা করে। পত্রপত্রিকায় শ্রমিক নেতা ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কুৎসা, ঘৃণা ও ক্রোধের বন্যা বয়ে যায়। প্রচার চলতে থাকে, 'তিন দিনের জন্য সভ্যতাকে বিদায় দিয়ে একটি প্রহরী কমিটি নিজেদের হাতেই আইন তুলে নেবে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে। শ্রমিক এলাকাগুলোতে অমানুষিক অত্যাচার ও সন্ত্রাস চলে এবং শ্রমিক নেতাদের গ্রেফতারের জন্য সরকারি মহল হন্যে হয়ে ওঠে। পত্রিকাগুলোতে আত্মগোপনকারী নেতাদের গ্রেফতার করা ও ফাঁসি দেয়ার কথা জোরেশোরে প্রচার চালানো হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই মাইকেল স্কোয়াব, জর্জ এঞ্জেল, অ্যাডলফ ফিসার, লুই লিংগ ও আস্কার নিবে-এই পাঁচ শ্রমিক নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

শ্রমিক নেতাদের বিচারের নামে প্রহসন: অভিযুক্ত শ্রমিক নেতাদের বিচার শুরু হয় ২১ জুন। প্রকৃতপক্ষে বিচারের নামে সেটা ছিল প্রহসন।

বিচারের শুরুতেই সবাইকে অবাক করে দিয়ে আদালত কক্ষে আত্মসমর্পণ করে দৃপ্তকণ্ঠে তিনি বললেন, হে মাননীয় বিচারক, 'আমি এসেছি আমার নিরপরাধ কমরেডদের সাথে বিচারের সম্মুখীন হতে।' প্রথমে অভিযুক্তদের মধ্যে আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা অস্কার নিবে। কাজের দীর্ঘ সময়ের জন্য শ্রমিকদের জীবনের অবর্ণনীয় দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন যে, এ হতভাগ্যদের সংগঠিত করে নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই হচ্ছে তার অপরাধ।

বিচারের জন্য যাদের জুরি নির্বাচিত করা হয়, তারা সবাই আগেই অভিযুক্ত শ্রমিক নেতাদের অপরাধী বলে প্রকাশ্য ঘোষণা দেন। বিচারের দিনে শিকাগোর মেহনতি মানুষেরা আদালত কক্ষে ভিড় জমায়। বিচারের দিন পর্যন্ত পার্সনস ছিলেন পলাতক। কিন্তু তিনি সেদিন আত্মসমর্পণ করেন। নিরপরাধ বন্ধুদের শাস্তি হবে আর তিনি লুকিয়ে থাকবেন, এভাবে চিন্তা করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। বিচারের শুরুতেই সবাইকে অবাক করে দিয়ে আদালত কক্ষে আত্মসমর্পণ করে দৃপ্তকণ্ঠে তিনি বললেন, হে মাননীয় বিচারক, 'আমি এসেছি আমার নিরপরাধ কমরেডদের সাথে বিচারের সম্মুখীন হতে।' প্রথমে অভিযুক্তদের মধ্যে আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা অস্কার নিবে। কাজের দীর্ঘ সময়ের জন্য শ্রমিকদের জীবনের অবর্ণনীয় দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন যে, এ হতভাগ্যদের সংগঠিত করে নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই হচ্ছে তার অপরাধ। অভিযোগে তাকে অন্যদের চেয়ে কম অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তিনি দৃঢ়ভাবে এই বলে বক্তব্য শেষ করেন যে, এসব যদি অপরাধই হয়, তবে অন্য বন্ধুদের চেয়ে আমার অপরাধ কোন দিক থেকেই কম নয়। তারপর পার্সনস আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উঠে দাঁড়ান। কোটের কলারে ফুল গুঁজে আর মুখে কবিতা আবৃত্তি করে তিনি বক্তৃতা শুরু করেন। দুই দিন ধরে পার্সনস নির্ভীকভাবে আবেগভরা কণ্ঠে দুঃখ-দুর্দশাপীড়িত খেটে খাওয়া মানুষের কাহিনী বলে যান। তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর শক্তি প্রয়োগের উত্তরে শক্তি প্রয়োগ ছাড়া তিনি কখনও হিংসার পক্ষে ওকালতি করেননি। তিনি হে মার্কেটে বোমা নিক্ষেপের জন্য শাসক গোষ্ঠীকে দায়ী করেন। শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে 'শ্রেণী শত্রুর ষড়যন্ত্রের কাহিনী' তুলে ধরে তিনি বলেন যে, 'আমি একজন নৈরাজ্যবাদী। আমি একজন সমাজতন্ত্রী। আমি যদি জীবনে অন্য পথ নিতাম, তাহলে হয়তো আজ শিকাগো শহরে রাজপথের ওপর সুন্দর ঘরে বিলাসে ও আয়েশে পরিবার পরিবৃত্ত হয়ে অপেক্ষারত দাসদের নিয়ে থাকতাম। কিন্তু আমি বেছে নিয়েছি অন্য পথ এবং আমি আজ দাঁড়িয়েছি এখানে এই মঞ্চে। এটা আমার অপরাধ। তারপর শ্রমিক নেতা স্পাইজ আত্মপক্ষসমর্থনে বক্তৃতায় তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলেন যে, 'অভাবে ও কষ্টে

> ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই ইউরোপ ও আমেরিকার ২০টি দেশের শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আন্তর্জাতিক শ্রমিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসেই 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' গঠিত হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসেই ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবি আদায়, শিকাগোর শহীদ শ্রমিক ভাইদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি প্রকাশের জন্য একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

খেটে খাওয়া লাখো লাখো নিষ্পেষিত যে আন্দোলনে মুক্তির আশা দেখে, আপনারা যদি ভেবে থাকেন যে, আমাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে আপনারা সেই শ্রমিক আন্দোলনকে উচ্ছেদ করতে পারবেন। যদি এটাই আপনাদের মত হয়, তাহলে দিন আমাদের ফাঁসি। এখানে একটা স্ফুলিঙ্গের উপরে আপনারা পা দেবেন, কিন্তু সেখান থেকেই আপনাদের পেছনে, আপনাদের সামনে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে লেলিহান অগ্নিশিখা। এটা ভূগর্ভের আগুন। আপনাদেরতো নেভানোর ক্ষমতা নেই। বিচারালয় ১৮৮৬ সালের ৯ অক্টোবর রায় প্রদান করেন। অস্কার নিবেকে ১৫ বছর কারাদণ্ড এবং অন্যদের ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি পুনরায় পরীক্ষা করতে অস্বীকার করলো। অবশেষে ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর ফাঁসির দিন নির্ধারিত হলো। ফাঁসির আগের দিন ১০ নভেম্বর গভর্নর মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দিয়ে ফিলডেন ও স্কোয়াবকে দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডের আদেশ দেন। ২২ বছরের যুবক লিংগকে জেলের সেলে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে পুলিশ বলে যে, লিংগ আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু আত্মহত্যা না খুন তার রহস্য কোন দিনই উদঘাটিত হলো না। ফাঁসির দিন সারারাত পার্সনস, স্পাইজ, ফিসার ও এঞ্জেল কেউ ঘুমালেন না। পার্সনস সারা রাত ধরে গাইলেন সংগ্রাম আর ভালোবাসার গান। শেষ বারের মতো পার্সনসের স্ত্রী লুসি শিশু-সন্তানদের নিয়ে স্বামীকে জেলখানায় দেখতে এলে তাদের একটি নিভৃত কক্ষে অন্তরীণ করে রাখা হয়।

মে দিবস পালনের ঘোষণা: আমেরিকার ফেডারেশন অব লেবার ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সেন্ট লুইস কংগ্রেসে শিকাগোর শহীদ শ্রমিক ভাইদের স্মরণ, ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবি আদায় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি প্রকাশের জন্য ১৮৯০ সালের ১ মে একটি দিবস পালনের ঘোষণা দেয়। দিবসটি পালনকে কেন্দ্র করে আমেরিকাজুড়ে শ্রমিকদের মধ্যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই ঢেউ ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৮০ এর দশকে ইউরোপের অনেক দেশে বিশেষত বেলজিয়াম, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, অস্ট্রিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অনুসারী শ্রমিক শ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠিত হয় এবং জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে শ্রমিক শ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলের বিস্তৃতি ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। ১৮৮৮ সালের নভেম্বরে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নের আহবানে লন্ডনে একটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে ইউরোপের খুব কম দেশ থেকে প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। এই কংগ্রেস একটি প্রস্তাবে ফ্রান্সের পসিবলিস্ট দলকে ১৮৮৯ সালে একটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেস আহবান করতে অনুরোধ জানায়। প্রায় একই সময়ে মার্কসবাদের অনুসারী ফ্রান্সের শ্রমিক পার্টি ও অন্যান্য শ্রমিক সংগঠন ঠিক করে যে, ১৮৮৯ সালের জুলাই মাসে প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই ইউরোপ ও আমেরিকার ২০টি দেশের শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আন্তর্জাতিক শ্রমিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসেই 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' গঠিত হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসেই ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবি আদায়, শিকাগোর শহীদ শ্রমিক ভাইদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি প্রকাশের জন্য একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তটি হলো পরবর্তী বছর ১ মে দিনটি সারা দুনিয়ায় ঐক্যবদ্ধভাবে পালন করা হবে। সিদ্ধান্তে বলা যায় যে, একটি বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে বড় করে প্রচার আন্দোলন ইত্যাদি এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে, যাতে সব দেশে এবং শহরে একই নির্দিষ্ট দিনে সমবেত হয়ে শ্রমিকরা কর্তৃপক্ষের কাজের সময় কমিয়ে ৮ ঘণ্টা করতে আওয়াজ তুলবে এবং প্যারিসে কংগ্রেসের অন্যান্য প্রস্তাবও কাজে লাগাতে সচেষ্ট হবে। যেহেতু ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সেন্ট লুইস কংগ্রেস আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার ১৮৯০ সালের ১ মে দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেহেতু এই ১ মে-ই আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে গৃহীত হলো। যে যে দেশে যেমন যেমন অবস্থা দাঁড়াবে, সেই রকম অবস্থা অনুযায়ী প্রচার আন্দোলন, বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতি সংগঠিত করতে হবে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮৯০ সালের ১ মে অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও আমেরিকায় শ্রমিক শ্রেণী মে দিবস পালন করে। বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রভাবশালী হয়ে উঠলে মে দিবস আর সমাজতন্ত্র একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় মে দিবসের বিপরীতে অপর একটি দিনকে প্রধান শ্রমিক দিবস হিসাবে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা পুঁজিবাদী দুনিয়ার পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমেরিকাতে ১ মের বদলে ১ সেপ্টেম্বরকে শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে পালন করা হতে থাকে। সরকারিভাবে সেপ্টেম্বরের প্রথম সোমবারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। পরে ১৯২৮ সালে ১ মে আন্তর্জাতিক শিশু দিবস হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করে। আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর রক্তাক্ত দিবসের স্মৃতিকে আড়াল করাই ছিল এসব প্রচেষ্টার লক্ষ্য। কিন্তু কোনো প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবেই প্রতিষ্ঠা পায়। জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন আইএলও মে দিবসের আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

শ্রমিক শ্রেণী ও সমাজতন্ত্র: উনবিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে ও বিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে পুঁজিবাদী উৎপাদন শান্তিপূর্ণভাবে ব্যাপকতা নিয়ে বিকশিত হতে থাকে। ফলে শ্রমিকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিকের মধ্যে স্তর বিভক্তি তা উঁচু-নিচু, দক্ষ-অদক্ষ সৃষ্টি হয়। মার্কস ও এঙ্গেলসের তত্ত্ব তখন বাস্তবের সাথে অনেক দিক থেকেই অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ পরিস্থিতিতে মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্ভাবিত তত্ত্ব ও মতামত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নিরঙ্কুশ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় না। ইতোমধ্যে শতাব্দীর শুরুতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পাঁয়তারা শুরু হলে বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনগুলো এবং এমনকি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের শাখাগুলো আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতির পথে না গিয়ে নিজ নিজ দেশের সরকারগুলোকে সমর্থন করে। আন্তর্জাতিক স্বার্থ রক্ষার চাইতে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতেই নিজ নিজ

শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা ও জীবনমানের উন্নতি ঘটানোর ক্ষেত্রে আইএলও প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভূমিকা রাখতে থাকলেও এ সংগঠনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ সংগঠন বিভিন্ন দেশের সরকারকে শ্রমিকদের উন্নয়নের স্বার্থে সুপারিশ করতে পারে, কিন্তু তা কার্যকর করতে নির্দেশ দিতে পারে না। আইএলও এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সদস্য দেশগুলোর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। প্রসঙ্গত ১৯২০ সালে আইএলও এর ওয়াশিংটন সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় ৮ ঘণ্টা সুপারিশ করা হলেও ভারতের ক্ষেত্রে তা ১০ ঘণ্টা রাখা হয়। তবে সার্বিক বিচারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় এই সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে।

দেশে সাধারণভাবে শ্রমিক শ্রেণী অবস্থান গ্রহণ করে। এ অবস্থায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিলুপ্তি ঘটে।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই জার শাসিত রাশিয়াতে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হয়ে ওঠে বলশেভিক পার্টি। যা পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে সুপরিচিত হয়। বলশেভিক পার্টির নেতা হিসেবে লেনিন পুঁজিবাদের উদ্ভব, বিকাশ ও পতনের যেসব নিয়ম মার্কস ও এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়ে তত্ত্ব ও মতামতের বিকাশ ঘটান। তিনি বলেন যে, পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উপনীত হয়েছে এবং এ স্তরই সর্বোচ্চ ও শেষ স্তর। সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌছার পর পুঁজিবাদ সমাজকে আর ভালো কিছু দিতে পারে না বলে মন্তব্য করে তথ্য ও যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ হলো পচনধরা মুমূর্ষু পুঁজিবাদ এবং এ স্তরেই পুঁজিবাদের পতন ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

রুশ দেশকে সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে দুর্বল গ্রন্থি হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি বলেন, রুশ দেশে শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল গড়ার মার্কস এঙ্গেলের নীতি ও কর্মসূচিকে আরও অগ্রসর করে নিয়ে তিনি বললেন যে, শ্রমিক বিপ্লবের হাতিয়ার হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টি।

এই তত্ত্বগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে লেনিনের নেতৃত্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাস রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই বিপ্লবের ভেতর দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। বিপ্লবের ফলে উৎপাদনের ওপর ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ ঘটে এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। রুশ বিপ্লবের পথ ধরে একে একে ১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে ফিনল্যান্ডে, নভেম্বরে জার্মানিতে বিপ্লব সংঘটিত হয়। জার্মানি ও ফিনল্যান্ডে শ্রমিক বিপ্লব পরাজয় বরণ করে। এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশে অর্থনৈতিক দাবিতে শ্রমিকদের শক্তিশালী ধর্মঘট আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে সোভিয়েত রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে তৃতীয় বারের মতো শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগঠন 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত' হয়। এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটি কমিনটার্ন নামে সুপরিচিত। লেনিনের চিন্তা ও মতামতের ভিত্তিতেই তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠিত ও এর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

আইএলও প্রতিষ্ঠা: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগঠন যখন বিশ্বের উন্নত ও পদানত জাতিগুলোর মধ্যে সুসংগঠিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে, তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর লিগ অব ন্যাশনস প্রতিষ্ঠিত হলে জাতিগুলোর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা স্বীকার করে নেয়া হয়। ১৯১৯ সালে লিগ অব ন্যাশনসের প্যারিস কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন আইএলও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৭ সালে বেলজিয়ামে আন্তর্জাতিক শ্রমিক কংগ্রেস, ১৮৮৯ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা, ১৯০০ সালে প্যারিস আন্তর্জাতিক কংগ্রেস ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর লেবার লেজিসলেশন (আই.এ.এল.এল) প্রতিষ্ঠা, ১৯০১ সালে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনগুলোর প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা ভিত্তি সৃষ্টি করে। আইএলও একটি ত্রিপক্ষীয় সংস্থা বিশেষ। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ব্যাপ্তি, জনপ্রিয়তা ও যৌক্তিকতাই এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটায়। শ্রমিক শ্রেণী ও মালিক শ্রেণীর স্বার্থ সুরক্ষা করে উৎপাদন বিকাশের লক্ষ্য রেখে এই সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে।

১৯১৯ সালের আইএলও এর প্রথম অধিবেশনে ৪০টি দেশের মধ্যে ভারত, চীনসহ এশিয়া-আফ্রিকার ২৩টি দেশ অংশগ্রহণ করে। ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিক ও সাংবাদিক আলবার্ট থমাস ১৯৩২ সাল পর্যন্ত ডাইরেক্টর হিসেবে আইএলও সুযোগ্যভাবে পরিচালনা করেন। শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা ও জীবনমানের উন্নতি ঘটানোর ক্ষেত্রে আইএলও প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভূমিকা রাখতে থাকলেও এ সংগঠনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ সংগঠন বিভিন্ন দেশের সরকারকে শ্রমিকদের উন্নয়নের স্বার্থে সুপারিশ করতে পারে, কিন্তু তা কার্যকর করতে নির্দেশ দিতে পারে না। আইএলও এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সদস্য দেশগুলোর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। প্রসঙ্গত ১৯২০ সালে আইএলও এর ওয়াশিংটন সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় ৮ ঘণ্টা সুপারিশ করা হলেও ভারতের ক্ষেত্রে তা ১০ ঘণ্টা রাখা হয়। তবে সার্বিক বিচারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় এই সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে।

পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভেতর দিয়ে লিগ অব ন্যাশনস ভেঙে গেলেও আইএলও ভাঙেনি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য ও সংহতিই এর কারণ। তবে কিছুদিনের মধ্যেই ইউনাইটেড ন্যাশনস অর্গানাইজেশন (ইউএনও) প্রতিষ্ঠিত হলে আইএলওকে এ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে এ সংস্থা শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। (চলবে)

লেখকঃ কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

জামায়াতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব

ড. সৈয়দ এ.কে.এম. সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী

ইসলামী শরিয়তে নামাজের গুরুত্ব : 'নামাজ' ফারসি শব্দ। আরবি শব্দ 'সালাত'। 'সালাত' এর আভিধানিক অর্থ দোয়া, রহমত, সান্নিধ্য, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। ইসলামী শরিয়তের আলোকে সালাত হলো 'শরিয়ত নির্দেশিত ক্রিয়াপদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহর নিকট বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা ও প্রার্থনা নিবেদন করা যা তাকবিরে তাহরিমা দ্বারা শুরু হয় এবং সালাম দ্বারা শেষ হয়।" ইসলামী জীবনব্যবস্থা পাঁচটি মৌল স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই পাঁচ স্তম্ভের দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো 'সালাত'। সালাত এর গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন :

০ অবশ্যই আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর। আর নামাজ কায়েম কর, আমার স্মরণের জন্যই। (সূরা ত্বাহা-১৪)

০ এবং নামাজ কায়েম কর। নিশ্চয়ই নামাজ অন্যায় অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। আর এর সর্বোপরি উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর স্মরণ। (সূরা আনকাবুত-৪৫)

০ এবং তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও। অবশ্যই তা কঠিন। কিন্তু বিনীতদের পক্ষে নয়। যারা বিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই তারা তাদের রবের সাথে মিলিত হবে এবং তারা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে। (সূরা বাকারা-৪৫)

০ আর তোমার পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ দাও এবং তুমি নিজেও তাতে অবিচল থাক। আমি তোমার নিকট কোনো জীবনোপকরণ চাই না। আমিই তোমাকে জীবন উপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকিদের জন্য। (সূরা ত্বহা-১৩২)

০ আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যারা ঈমান এনেছে, তারা নামাজ কায়েম রাখুক এবং আমার দেওয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক, ঐদিন আসার আগে, যে দিন কোনো বেচাকেনা নেই এবং বন্ধুত্বও নেই। (সূরা ইবরাহিম-৩১)

০ "বলবে: তোমাদের কিসে জাহান্নামে নিয়ে এসেছে? তারা বলবে, আমরা নামাজ আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। অভাবগ্রস্তদের খাবার দিতাম না। আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম। আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত...... । (সূরা মুদ্দাসসির: ৪২-৪৭)

০ তোমরা নামাজ আদায় কর ও যাকাত প্রদান কর। (সূরা বাকারা-৪৩)

০ পরম দয়ালু আল্লাহর কাছে প্রিয় বান্দা হলো তারা, যারা জমিনের উপর বিনয়ের সহিত চলে ....এবং তারা ঐ সমস্ত লোক যারা রাতভর আপন রবের উদ্দেশ্য সেজদা ও নামাজে দণ্ডায়মান অবস্থায় কাটিয়ে দেয়। (সূরা ফোরকান: ৬৩-৬৪)

০ অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাজে নম্র ও বিনয়ী। (সূরা মুমিনুল: ১-২)

০ নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করা মুমিনদের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। (সূরা নিসা: ১০৩)

সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন :

০ ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল, এই কথায় সাক্ষ্য প্রদান করা, নামাজ কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ করা এবং রমযান মাসের রোযা পালন করা। (বোখারী)

০ নিশ্চয়ই মুমিন এবং মুশরিক ও কাফির এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী নিয়ামক হলো নামাজ। (মুসলিম)

০ আমর ইবনে শু'আইব তার পিতা থেকে, তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের সন্তানদের সাত বছর

যারা সকল নামাজ ওয়াক্তমত (সময়মত) পড়েন অথচ অধিকাংশ নামাজ একা-একা পড়েন অর্থাৎ যাদের নিকট জামায়াতের কোনো মূল্য বা গুরুত্ব নেই তাদের জন্য আল্লাহর রাসূল (সা) ৯টি শাস্তির (হাদিসটির বর্ণনাকারী হযরত আলী রা) সংবাদ দিয়েছেন। তার মধ্যে ৩টি দুনিয়াতে, ৩টি কবরে এবং ৩টি হাশরে।

দুনিয়ার ৩টি হলো- (ক) রুজি থেকে বরকত উঠে যাবে (খ) চেহারা থেকে মায়ার আকর্ষণ চলে যাবে (গ) মানুষ তাকে অপছন্দ করতে থাকবে।

কবরের ৩টি হলো- (ক) কবর অন্ধকার হবে (খ) কবর খুব সঙ্কুচিত হবে (গ) সওয়াল জবাব কঠিন হবে।

হাশরের ৩টি হলো- (ক) শরীর থেকে অঝোরে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম বের হবে (খ) মিযানে হিসাব কঠিন হবে (গ) পুলসেরাত পার হওয়া কষ্টকর হবে।

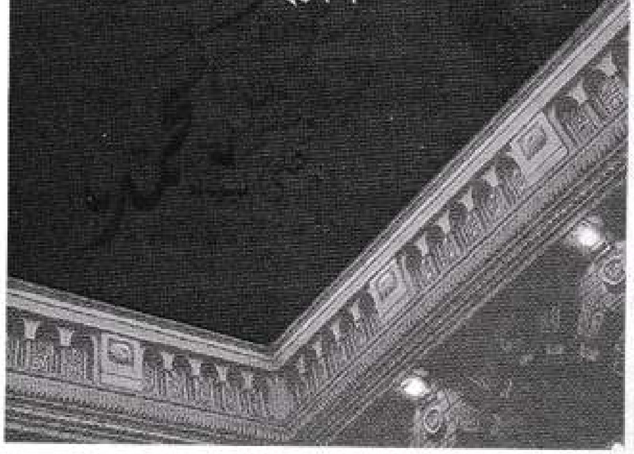

থেকে নামাজের নির্দেশ প্রদান করবে এবং দশ বছরে তাদেরকে নামাজের জন্য প্রহার করবে এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দেবে। (আবু দাউদ)

০ রাসূল (সা) বলেন, হাশরের ময়দানে বান্দাকে প্রথম যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে তা হলো 'নামাজ'। এ বিষয়ে উত্তর ইতিবাচক হলে তার অন্যান্য যাবতীয় কাজ সঠিক হয়েছে বলে প্রতীয়মান হবে। নামাজের হিসাব দুর্বল হলে তার বাকি আমল বরবাদ হয়ে যাবে। (তাবারানি)

০ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)কে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর কত ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন? রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের ওপর পাঁচবার/পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। (সুনানে নাসাঈ)

০ বুরাইদা (রা) তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমাদের ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ। যে ব্যক্তি নামাজ পরিত্যাগ করবে সে কাফির হয়ে যাবে। (সুনানে নাসাঈ ও তিরমিযী)

০ রাসূল (সা) বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কারো গৃহের দ্বারে প্রবাহিত নদীর ন্যায়। যদি সে তাতে পাঁচবার গোসল করে, তবে তার শরীরে যেমন ময়লা থাকতে পারে না। তেমনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তার পাপরাশি দূর করে দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

০ রাসূল (সা) বলেন, "পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এক জুমা হতে পরবর্তী জুমা এবং এক রমযান হতে পরবর্তী রমযানের মধ্যকার যাবতীয় (সগিরা) গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ, যদি সে কবিরা গুনাহসমূহ হতে বিরত থাকে।" (মুসলিম)

০ হানযালা আল কাতিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করবে, নামাজের রুকু, সেজদা, ওযু ও সময়সূচি যত্নসহকারে পালন করবে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর অর্পিত অবশ্য কর্তব্য, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসানদে আহমদ)

০ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) একদা নামাজের কথা উল্লেখ করে বলেন, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে নামাজ আদায় করবে তার জন্য নামাজ কেয়ামতের দিন নুর, দলিল ও মুক্তির উপায় হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যে ব্যক্তি সঠিকভাবে তা পালন করবে না, কিয়ামতে তার কোনো নুর থাকবে না, দলিলও থাকবে না এবং তার নাজাতের কোনো উপায়ও থাকবে না। সে কেয়ামতের দিন কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে। (মুসনাদে আহমদ)

আজকে আমরা যদি সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের দিকে তাকাই তবে নামাজের ক্ষেত্রে আমরা মুসলমানদের চার শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি। প্রথম শ্রেণি হলো 'বেনামাজি' অর্থাৎ যারা নামে মুসলমান কিন্তু নামায মোটেই পড়ে না। দ্বিতীয় শ্রেণি হলো 'অনিয়মিত নামাজি'। অর্থাৎ যারা কখনও পড়ে কখনও পড়ে না। তৃতীয়ত শ্রেণি হলো 'একা একা পড়া নামাজি'। অর্থাৎ যারা সব নামাজ ওয়াক্ত মত পড়ে কিন্তু তারা বেশির ভাগ একা পড়ে, তারা জামায়াতের দ্বার ধারে না। চতুর্থ শ্রেণি হলো 'নিয়মিত জামায়াতের সাথে পড়া নামাজি'। অর্থাৎ তারা শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত কোনো নামাজের জামায়াত ত্যাগ করে না। নিম্নে উক্ত চার শ্রেণির মুসলমানদের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হলো:

১) বেনামাজি : বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে যারা সম্পূর্ণভাবে বেনামাজি হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী তাদের হাশর হবে ফেরাউন, হামান, কারুন ও উবাই ইবনে খালফের সাথে। এর ব্যাখ্যায় ইসলামী স্কলারগণ বলেছেন, মুসলমানদের মাঝে যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক হওয়ার

কারণে নামাজ পড়বে না তাদের হাশর হবে ফেরাউনের সাথে। কেননা ফেরাউন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক হওয়ায় সে আল্লাহর সাথে কুফরি করেছে। যারা প্রশাসনিক ক্ষমতার মালিক হওয়ার কারণে নামাজ পড়বে না তাদের হাশর হবে হামানের সাথে। কেননা সে উজির বা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কারণে আল্লাহকে অস্বীকার করেছে। যারা প্রচুর অর্থের মালিক হওয়ার কারণে নামাজ পড়বে না তাদের হাশর হবে কারুনের সাথে। কেননা সে প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হওয়ার কারণে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি। যারা বড় ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে নামাজ পড়বে না তাদের হাশর হবে আরবের বিখ্যাত ব্যবসায়ী উবাই ইবনে খালফের সাথে। কেননা সে বড় ধরনের ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে আল্লাহর উপর ঈমান আনেনি এবং সালাত কায়েম করেনি।

২) অনিয়মিত নামাজি : অনিয়মিত নামাজি বা ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ তরফকারী কী ধরনের অপরাধী তার বর্ণনা এসেছে বনি ইসরাইলের এক ঘটনায়। ঘটনার সারসংক্ষেপ হলো– "মূসা (আ) এর নিকট এক মহিলা এসে তার দ্বারা সংঘটিত দুইটি অপরাধের বিবরণ দেন। প্রথমত: ব্যভিচার, দ্বিতীয়ত: এর মাধ্যমে জন্ম নেওয়া অবৈধ সন্তানকে হত্যা। মহিলা এর জন্য নিজে তওবা করেন এবং মূসা (আ)-এর নিকট তার পক্ষে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া করার অনুরোধ করেন। মূসা (আ) উত্তেজিত হয়ে মহিলাকে এই বলে বিতাড়িত করেন যে, তোমার মত জঘন্য পাপীর উপস্থিতির কারণে আল্লাহ এখানে আগুনের গজব দিবেন এবং আমরা সকলেই ভস্মীভূত হব।" মহিলা চলে যাওয়ার পর জিবরাইল এসে মূসা (আ)কে বললেন, "আল্লাহ জানতে চেয়েছেন, আপনি কেন মহিলাকে তাড়িয়ে দিলেন। মূসা (আ) তার কারণ ব্যাখ্যা করলে জিবরাইল জানান যে, এই পৃথিবীতে এই মহিলার চাইতেও আরও জঘন্য পাপী রয়েছে আর তারা হলো ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ তরফকারী বা অনিয়মিত নামাজি।"

৩) একা-একা পড়া নামাজি : যারা সকল নামাজ ওয়াক্তমত (সময়মত) পড়েন অথচ অধিকাংশ নামাজ একা-একা পড়েন অর্থাৎ যাদের নিকট জামায়াতের কোনো মূল্য বা গুরুত্ব নেই তাদের জন্য আল্লাহর রাসূল (সা) ৯টি শাস্তির (হাদিসটির বর্ণনাকারী হযরত আলী রা) সংবাদ দিয়েছেন। তার মধ্যে ৩টি দুনিয়াতে, ৩টি কবরে এবং ৩টি হাশরে। দুনিয়ার ৩টি হলো (ক) রুজি থেকে বরকত উঠে যাবে (খ) চেহারা থেকে মায়ার আকর্ষণ চলে যাবে (গ) মানুষ তাকে অপছন্দ করতে থাকবে। কবরের ৩টি হলো (ক) কবর অন্ধকার হবে (খ) কবর খুব সঙ্কুচিত হবে (গ) সওয়াল জবাব কঠিন হবে। হাশরের ৩টি হলো (ক) শরীর থেকে অঝোরে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম বের হবে (খ) মিযানে হিসাব কঠিন হবে (গ) পুলসেরাত পার হওয়া কষ্টকর হবে।

৪) নিয়মিত জামায়াতের সাথে পড়া নামাজি : এই শ্রেণির লোকই প্রকৃত মুসলমান ও প্রকৃত নামাজি। মূলত: নামাজ ফরজ হয়েছে জামায়াতে পড়ার জন্য। জামায়াত ব্যতীত নামাজ নেই। একজন মুসলমানের শরিয়ত সম্মত ওজর ব্যতীত তাকবির উলার সহিত জামায়াতে নামাজ না পড়ার কোনো সুযোগ নেই।

(খ) নামাজ কায়েম কিভাবে হবে? ঃ আমরা বর্তমানে কিছু সংখ্যক মুসলমান জামায়াতে নামাজ পড়ি এবং অধিকাংশ মুসলমান নামাজ পড়ি না আবার কিছু সংখ্যক মুসলমান একা একা নামাজ পড়ি এটাকে নামাজ কায়েম বলে না। কায়েম হচ্ছে সমাজে কোন একটা জিনিস এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা বা চালু থাকা- যা সমাজের সকলে অনুসরণ করে এবং সমাজের কেউ তা না মানলে সকলে তাকে ঘৃণার চোখে দেখে বা অপরাধী হিসেবে গণ্য করে ও প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যেমন এখন থেকে ৬০-৭০ বছর আগে আমাদের দেশে নেংটি পরা মানুষ বেশি ছিল। খুব কম লোকই লুঙ্গি পরত। তখন সমাজে লুঙ্গি পরা কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত না থাকায় নেংটি পরাকে কেউ অপরাধ মনে করতো না। আজ আমাদের সমাজে লুঙ্গি পরা কায়েম হয়েছে। এখন কেউ নেংটি পরে না। বর্তমানে কেউ নেংটি পরলে তাকে সকলে ঘৃণার চোখে দেখবে এবং অপরাধী হিসেবে গণ্য করবে। অনুরূপ বর্তমানে আমাদের সমাজে নামাজ কায়েম না থাকায় আমরা কেউ বেনামাজিকে ঘৃণা করি না। তাকে অপরাধী হিসেবে শাস্তির আওতায় নিই না। সমাজে যখন নামাজ কায়েম হবে তখন সকলেই বেনামাজিকে ঘৃণা করবে এবং তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিবে। মূলত যখন কোনো মুসলিম সমাজব্যবস্থায় মসজিদে আযান দেওয়ার পর কৃষক তার লাঙ্গল রেখে, ব্যবসায়ী তার দোকান বন্ধ করে, চাকরীজীবী তার কর্মস্থল ত্যাগ করে, ড্রাইভার তার গাড়ি চালনা বন্ধ করে অর্থাৎ সকল পেশার মানুষ তাদের কার্যক্রম স্থগিত রেখে মসজিদে এসে জামায়াতে নামাজ পড়বে এবং নামাজ শেষে আবার স্ব-স্ব কর্মস্থলে ফেরত যাবে তখনই ঐ সমাজে নামাজ কায়েম রয়েছে বলে বিবেচিত হবে। নামাজ কায়েম ব্যক্তি থেকে শুরু হতে হবে। প্রথমে ব্যক্তি নিজে নামায কায়েম করবে এবং সাথে সাথে তার পরিবার ও সমাজে নামাজ কায়েমের চেষ্টা চালাবে। নামাজ কায়েম আবার দুই ধরনের, একটি হলো আনুষ্ঠানিক যা ব্যক্তি মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামাজ পড়বে আর অপরটি হলো প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে নামাজের যে অন্তর্নিহিত আবেদন রয়েছে তার প্রতিফলন ঘটাবে। যেমন নামাজের অন্তর্নিহিত আবেদন হলো নামাজি ব্যক্তি সকল অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা এবং হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকবে, নেতার আনুগত্য করবে, শৃঙ্খলাবোধ মেনে চলবে, কারো উপর জুলুম করবে না, সময় সচেতন হবে, বিনয়ী হবে, অহঙ্কার ও দাম্ভিক হবে না ইত্যাদি। সমাজ ও রাষ্ট্রের নামাজ কায়েম ও অনুরূপ। যে সমাজ ও রাষ্ট্রে নামাজ কায়েম থাকবে ঐ সমাজ ও রাষ্ট্রে অন্যায়, অত্যাচার, খুন, রাহাজানি, জুলুম, সুদ, ঘুষ, জুয়া, অশ্লীলতা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না।

(গ) ইসলামী শরিয়তে জামায়াতে নামাজের গুরুত্ব ঃ হযরত আবু দারদা (রা) একদিন অত্যন্ত মলিন মুখে রাসূল (সা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বিরাট সর্বনাশ হয়ে গেছে। রাসূল (সা) বললেন, তোমার কী হয়েছে? আবু দারদা (রা) বললেন, আমার বাণিজ্য কাফেলা হতে মাল বোঝাই করা ১০টি উট হারিয়ে গেছে। রাসূল (সা) বললেন এই কথা? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি জামায়াতের তাকবির উলা হারিয়েছ। উত্তরে আবু দারদা (রা) বললেন, হে আল্লাহ রাসূল (সা) আমার মাল বোঝাই করা ১০টি উটের চাইতে কী একটি জামায়াতের তাকবির উলার মূল্য আরও বেশি? রাসূল (সা) বললেন, হে আবু দারদা! তুমি বল কী? তুমি যদি যেকোনো ফরজ নামাজের জামায়াতের তাকবির উলা হারাও তাহলে দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত হারালে যে পরিমাণ ক্ষতি তোমার হবে, তার চাইতেও বেশি ক্ষতি হবে। উক্ত হাদিসের মাধ্যমে জামায়াতে নামাজের গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। জামায়াতে নামাজের গুরুত্ব প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন–

০ স্মরণ কর সেই দিনের কথা, যেদিন (তোমার রব) পায়ের পিণ্ডলী (হাঁটুর নিম্নাংশ) উন্মোচন করবে এবং তাদের কে আহ্বান করবে সেজদা করার জন্য। কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথচ তারা (পৃথিবীতে) নিরাপদ ছিল, তখনতো তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল (আজানের মাধ্যমে) সেজদা করতে। -(সূরা আল-কালাম : ৪২-৪৩)

০ তোমরা নামাজ কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে মিলে রুকু কর। (সূরা বাকারা : ৪৩)

০ যখন আপনি তাদের মাঝে থাকবেন ও নামাজের জন্য দাঁড়াবেন, তখন তাদের একদল আপনার সাথে দাঁড়াবে এবং তাদের অস্ত্রগুলো সাথে নিবে। অতঃপর যখন সিজদা করবে তখন যেন আপনাদের পিছনে অপর দল থাকে আর অপর দল যারা নামাজ পড়েনি তারা এসে আপনার সাথে নামাজ পড়বে এবং সতর্ক হবে ও তাদের অস্ত্র সাথে নিবে। (সূরা নিসা : ১০২)

০ নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করা মুমিনের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। (সূরা নিসা : ১০৩)

০ এবং নামাজের পাবন্দি করো দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে। নিঃসন্দেহে সৎকর্মসমূহ অসৎ কর্মসমূহকে মিটিয়ে দেয়। এটা হচ্ছে এক নসিহত, নসিহত মান্যকারীদের জন্য। (সূরা হুদ : ১১৪)

০ হে মুমিনগণ! জুমার দিনে যখন নামাজের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণ পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (সূরা জুমা : ৯)

সূরা জুমার উক্ত আয়াতে কেবল জুমার আযানের কথা বলা হলেও তাফসিরকারকদের মতে সকল নামাজের আযানের পর বেচাকেনা বন্ধ করে জামায়াতে শরিক হওয়া ওয়াজিব।

জামায়াতের গুরুত্ব প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেন : ০ একা নামাজের চেয়ে জামায়াতে নামাজের মর্যাদা সাতাশ গুণ বেশি। (মুসলিম)

০ মুনাফিকের জন্য সবচেয়ে কঠিন নামাজ হলো ইশা ও ফজর। তারা যদি এ দুই নামাজের মর্যাদা ও বিনিময় সম্পর্কে জানত, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামায়াতে শামিল হতো। আমি এ সংকল্প করেছিলাম যে, একজনকে নামাজ পড়াতে আদেশ দিব আর আমি কিছু লোককে নিয়ে, যাদের সঙ্গে লাকড়ির বোঝা থাকবে, ঐসব লোকের বাড়ি যাব, যারা নামাজে আসে না, এরপর তাদেরকে ও তাদের ঘর-বাড়িগুলোকে আগুনে জ্বালিয়ে দেব। (মুসলিম)

(উল্লেখ্য যে, অন্য হাদিসে এসেছে, রাসূল (সা) বলেন, আমি অবশ্যই এ কাজ করতাম যদি না বাড়িগুলোতে শিশু, মহিলা ও অক্ষম বৃদ্ধরা না থাকতো।)

০ মানুষ যদি আযান দেয়া ও প্রথম কাতারে নামাজ পড়ার ফজিলত জানত তাহলে লটারি করে হলেও তারা সুযোগ লাভের চেষ্টা করতো। (মুসলিম)

০ রাসূল (সা) বলেন, আল্লাহর নিকট প্রিয়তর স্থান হচ্ছে মসজিদ এবং নিকৃষ্টতম স্থান হচ্ছে বাজার। (মিশকাত)

০ রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় (পাঁচ ওয়াক্ত সালাত) মসজিদে যাতায়াত করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারি প্রস্তুত রাখেন। (মিশকাত)

০ কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়াতলে যে সাত শ্রেণির লোক আশ্রয় পাবে, তাদের এক শ্রেণি হল ঐ সকল ব্যক্তি যাদের অন্তর মসজিদের সাথে লটকানো থাকে। (মিশকাত)

০ রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি এশার সালাত জামায়াতে পড়ল, সে যেন অর্ধরাত্রি সালাতে কাটাল এবং যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামায়াতে পড়লো (একই ব্যক্তি) সে যেন সমস্ত রাত্রি সালাতে অতিবাহিত করল। (মুসলিম, মিশকাত)

০ রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ৪০ দিন তাকবিরে উলাসহ জামায়াতে সালাত আদায় করল তার জন্য দুইটি মুক্তি লেখা হয়। একটি হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি, অপরটি হলো নিফাক থেকে মুক্তি। (তিরমিযি, মিশকাত)

০ রাসূল (সা) বলেন, কোনো গ্রাম বা বস্তিতে যদি তিনজন মুসলমানও থাকে, যদি তারা জামায়াতে সালাত আদায় না করে, তাহলে তাদের ওপর শয়তান বিজয়ী হবে। আর বিচ্ছিন্ন বকরিকেই নেকড়ে ধরে খেয়ে ফেলে। (আবু দাউদ)

০ রাসূল (সা) বলেন, যখন কোনো মুসল্লি সুন্দরভাবে অযু করে জামায়াতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, তখন তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটি করে নেকি লেখা হয় ও একটি করে মর্যাদার স্তর উন্নীত হয় এবং একটি করে গুনাহ ঝরে পড়ে। যতক্ষণ ঐ ব্যক্তি সালাতরত থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার জন্য দোয়া করতে থাকে ও বলে যে, হে আল্লাহ! তুমি তার উপর শান্তি বর্ষণ কর। তুমি তার উপর অনুগ্রহ কর। যতক্ষণ সে কথা না বলে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা আরও বলতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর। তুমি তার তওবা কবুল কর। (মিশকাত)

০ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা) এর সাথে একদা মাগরিবের সালাত পড়লাম। সালাত পড়ার পর কেউ ঘরে ফিরে গেল আর কেউ কেউ এশা পর্যন্ত মসজিদে থাকল। তখন নবী (সা) হাঁপাতে হাঁপাতে তড়িঘড়ি করে এমন অবস্থায় আসলেন যে তাঁর হাঁটু খোলা ছিল। তিনি বললেন, তোমরা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে এই সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, তোমাদের প্রতিপালক আকাশের একটি দরজা খুলে (তা দিয়ে) ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করে বলেন, তোমরা আমার বান্দাদের দেখ। তারা এক ফরজ সালাত আদায় করে আরেক ফরজ সালাতের অপেক্ষায় বসে আছে। (ইবনে মাজা)

এ ছাড়া রাসূল (সা) কর্তৃক এক অন্ধের প্রতি মসজিদে আসার নির্দেশ জামায়াতে নামাজ মুসলমানদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে হাদিসটি হলো "আমর ইবনে উম্মে মাকতুম রাসূল (সা) এর নিকট এসে বললেন, হে রাসূল (সা) মদীনা অনেক হিংস্র জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ শহর। আমি চোখে দেখি না, বাড়িও অনেক দূরে। আমাকে মসজিদে নিয়ে যেতে পারে এমন একজন লোক আছে বটে, তবে সে আমার উপযুক্ত নয়। আমি কি বাড়িতে নামাজ পড়তে পারি? রাসূল (সা) (কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে প্রথমে অনুমতি দিলেন, তিনি যেতে উদ্যত হলে পুনরায় ডাকলেন) জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন হ্যাঁ পাই।" রাসূল (সা) বললেন, "তাহলে তুমি মসজিদে যাবে। আমি তোমাকে বাড়িতে নামাজ পড়ার অনুমতি দিতে পারি না।" (আবু দাউদ)। এ ছাড়া হযরত ওমর (রা) বলেন, "যখন কেউ ফজর ও ইশার জামায়াতে অনুপস্থিত থাকতো তখন আমরা মনে করতাম সে মুনাফিক হয়ে গেছে।"

মহান রাব্বুল আলামিন একজন মুসলমানের জন্য ঈমান গ্রহণ করার পর যে আমলটি ফরজ করেছেন, তা হলো নামাজ। মুসলমান এবং অমুসলমানের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড হলো নামাজ। রাসূল (সা) পৃথিবী থেকে ওফাতের সময় যে দুইটি অন্তিম অসিয়ত করেছেন, তার একটি হলো নামাজের হেফাজত অপরটি হলো দাস-দাসীর সাথে ভালো ব্যবহার। আল্লাহর সাথে বান্দার গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যম হলো নামাজ। বান্দা আল্লাহর অতি নিকটে যাওয়ার সুযোগ হলো নামাজের সেজদা। এই নামাজকে কায়েম করতে হবে জামায়াতের মাধ্যমে। একা একা কখনো নামাজ কায়েম হবে না। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নামাজ কায়েমের তৌফিক দিন। আমিন।

লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি, চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তর, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা চর্চা ও ভাষা আন্দোলনে শ্রমিকদের অবদান

ড. মোঃ জিয়াউল হক

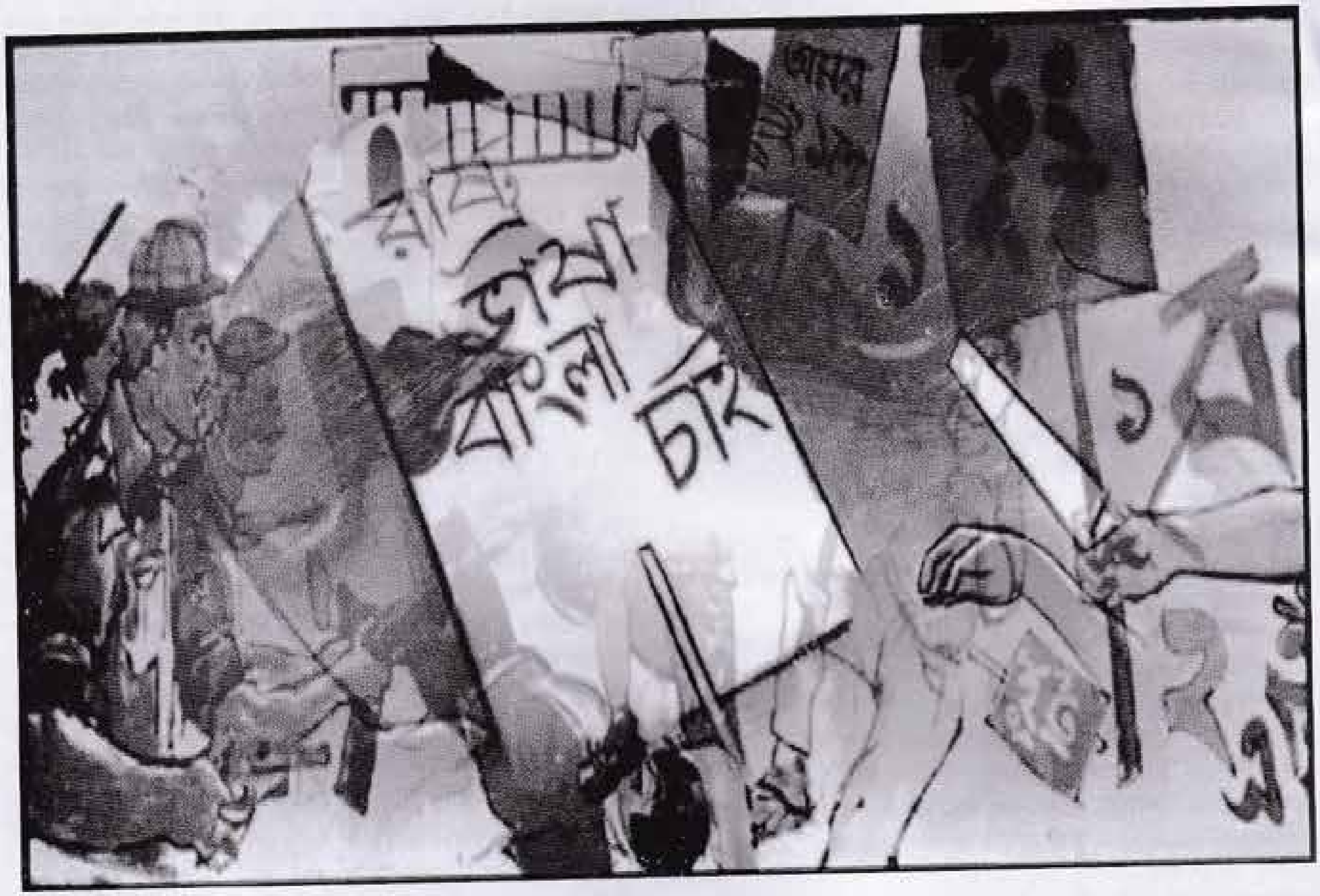

পেই মেরিওর মতে পৃথিবীতে সাড়ে চার হাজারের অধিক ভাষা প্রচলিত আছে। এ সকল ভাষা মহান আল্লাহরই সৃষ্টি। যে ভাষায় যে কথা বলে তা অন্য কেউ না বুঝলেও বুঝেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনি মানুষকে মনের ভাবাবেগ আদান প্রদান, দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-উল্লাস প্রকাশের জন্য বাকশক্তি দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন:

الرَّحْمٰنُ - عَلَّمَ الْقُرْآنَ - خَلَقَ الْإِنسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

অর্থ: তিনি রহমান, শিক্ষা দিলেন আল কুরআন, সৃষ্টি করলেন ইনসান, দিলেন ভাষা জ্ঞান। (সূরা আর-রাহমান :১-৪) মহান আল্লাহ মানবজাতিকে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) থেকে সৃষ্টি করে বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোত্র ও বংশে এবং বিভিন্ন ভাষা দিয়ে বিভক্ত করে দিয়েছেন। তাই মানুষের অবয়ব একই রকম হওয়ার পরেও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যে দেশে যে জন্মগ্রহণ করেন সে তার মায়ের মুখের ভাষাকে নিজের ভাষা হিসেবে লাভ করে থাকেন। এর জন্য তাকে কোন চেষ্টা তদবির করতে হয় না। মানুষের বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হওয়া এবং ভাষার বিচিত্রতা আল্লাহর বিরাট নিদর্শন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

অর্থ: আর তার নিদর্শন সমূহের মধ্যে আছে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি এবং তোমাদের মুখের ভাষা ও গাত্রের বর্ণের বিচিত্রতা। (সূরা-রূম, আয়াত: ২২) সুতরাং যে ভাষায় যে জন্মগ্রহণ করেছে, সে ভাষাই আল্লাহর নিদর্শন। তাই তাকে সে ভাষাই বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা ও শুদ্ধভাবে লেখা কর্তব্য। কোনভাবেই মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা যাবে না। তাই কবি আব্দুল হাকীম বলেছেন:

যেই দেশে যেই বাক্য
কহে নরগণ
সেই বাক্য বুঝে প্রভু

আপে নিরঞ্জন।

আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা এ ভাষাতেই আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি। যে কোন বিষয় মানুষের মনের ভাব প্রকাশ ও আত্মার আত্মীয় বানাতে মাতৃভাষার বিকল্প নেই। আল্লাহ তা'য়ালা এক্ষেত্রে মাতৃভাষাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

অর্থ: আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার নিজ জাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি। যাতে তিনি তাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত : ৪)

আল্লাহ যেখানে কোন নবী বা রাসূল প্রেরণ করেছেন সেখানে তিনি সে জাতির মাতৃভাষা দিয়ে নবী-রাসূল এবং আসমানি কিতাব প্রেরণ করেছেন। তিনি নির্দিষ্ট কোন ভাষাতে নবী ও রাসূল পাঠাননি। অর্থাৎ সকল মাতৃভাষা আল্লাহর নিকট প্রিয় ভাষা। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। এ ভাষাও মহান আল্লাহর প্রিয় ভাষা। ইহা আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। তাই ইহার যথাযোগ্য মর্যাদা এবং সম্মান দেয়া আমাদের প্রত্যেকেরই নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। তা ভিন্নে আমাদের অস্তিত্ব ও মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবে। তাই কবি বলেন:

যে জন বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে জন কাহার জন্ম নির্ণয় ন'জানি।

মানুষের পিতৃপরিচয় যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমন মাতৃভাষাও অবজ্ঞা করা যায় না। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন আরবি তাঁর মাতৃভাষাও ছিল আরবি এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষাও আরবি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا

অর্থ: আমি তো আপনার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা ধর্মভীরুদের সু-সংবাদ দেন এবং বাগবিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন। (সূরা: মারিয়াম, আয়াত: ৯৭)

এসব আয়াতের বিবেচনায় আমরা এক দিকে মাতৃভাষা শিক্ষা ও চর্চার ব্যাপক গুরুত্ব অনুধাবন করি। অপর দিকে মাতৃভাষায় দ্বীন ইসলামের চর্চা ও কুরআন হাদীসের শিক্ষা সহজ, সরল, বিশুদ্ধ ও সাবলীল ভাষায় জনগণের সামনে তুলে ধরার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে প্রকৃতপক্ষে আমরা সে অর্থে গ্রহণ করতে পারিনি। আমরা বাংলাকে সংস্কৃত ও হিন্দুদের ভাষা বলে ধারণা পোষণ করে থাকি। বাংলা ভাষাকে অবহেলা করে ধর্মীয় কারণে আরবি ভাষাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি। যার কারণে বাংলায় ধর্মীয় বইপুস্তক রচনা ও অনুবাদে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.), মাওলানা আকরম খাঁ, মুফতি মোহাম্মদ শফী, আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী, শিবলী নোমানী প্রমুখ উলামায়ে কিরাম তাদের মাতৃভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থাদি রচনা করে আজ বিশ্ব দরবারে খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং তাঁদের রচিত বইপুস্তক বাংলা, ইংরেজি, আরবিসহ বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ ছাড়া উর্দু ভাষাতেই ইসলামের উপর হাজার হাজার বইপুস্তক রচিত হয়েছে। অথচ উর্দু যাদের মাতৃভাষা তাদের চেয়ে বাংলা যাদের মাতৃভাষা তাদের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। কিন্তু বাংলা ভাষায় ধর্মীয় বইপুস্তক রচিত হয়েছে স্বল্প সংখ্যক। এর পিছনে প্রধান কারণ হলো বাংলাদেশে আলেমসমাজ তথা ধর্মীয় নেতাদের

ভাষা লেখার ক্ষেত্রে যেমন যত্নশীল হওয়া দরকার, বলার ক্ষেত্রেও তেমন সতর্ক থাকা প্রয়োজন। উত্তম ও বিশুদ্ধ লেখা যেমন ভাষাকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী করে তেমন সঠিক উচ্চারণ ভাষাকে শ্রুতিমধুর ও প্রাঞ্জল করে। লেখার মাধ্যমে শুধুমাত্র শিক্ষিত সমাজের নিকট ভাষার লালিত্য ও সমৃদ্ধতা প্রকাশিত হয়। আর বলার মাধ্যমে শিক্ষিত মূর্খ সর্বস্তরের মানুষের নিকট এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বললে মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় এবং লোকসমাজে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সেই সাথে ভাষার উচ্চাঙ্গের শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়।

মাতৃভাষা চর্চায় আগ্রহের অভাব। তাদের মাঝে বদ্ধধারণা ছিল যে মাতৃভাষায় ধর্মীয় বই-পুস্তক রচনা করলে তা সঠিক হবে না এবং পাঠকসমাজে সমাদৃত হবে না। বাংলাদেশে ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে মাওলানা আকরম খাঁ, অধ্যাপক গোলাম আযম, ফররুখ আহমদ, আব্দুল্লা হীল কাফী, মাওলানা আ: রহীম, মাওলানা আমিনুল ইসলাম, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আল্লামা দেলাওয়ার হুসাইন সাঈদী, ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, ড. আব্দুল মা'বুদ প্রমুখ ব্যক্তি তাঁদের গভীর পাণ্ডিত্যের দ্বারা বহু ধর্মীয় বই-পুস্তক রচনা ও অনুবাদ করেছেন। তাঁদের এ সমস্ত বই-পুস্তক পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়েছে। প্রতিভাবান এ সমস্ত বাংলা ভাষাপ্রেমী লেখকদের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ মাতৃভাষায় ইসলাম চর্চা করা। বাংলাভাষার উপর তাঁদের দখল কোন সংস্কৃত জানা পণ্ডিত বা মহাজ্ঞানী অপেক্ষা কম ছিল না। তাই তাঁরা মনের ভাব অতি সহজেই প্রকাশ করতে পেরেছেন। যারা মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চায় তাদের মতো আগ্রহী হননি তাঁরা মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চায় অবদান রাখতেও পারেননি। অথচ মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চার প্রভাব শুধু সমকালে নয়; অনাগত ভবিষ্যতের উপরও। তাই লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও আলেম উলামাসহ সকলেরই সংকীর্ণতা পরিহার করে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাতেই সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করা উচিত।

ভাষা লেখার ক্ষেত্রে যেমন যত্নশীল হওয়া দরকার, বলার ক্ষেত্রেও তেমন সতর্ক থাকা প্রয়োজন। উত্তম ও বিশুদ্ধ লেখা যেমন ভাষাকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী করে তেমন সঠিক উচ্চারণ ভাষাকে শ্রুতিমধুর ও প্রাঞ্জল করে। লেখার মাধ্যমে শুধুমাত্র শিক্ষিত সমাজের নিকট ভাষার লালিত্য ও সমৃদ্ধতা প্রকাশিত হয়। আর বলার মাধ্যমে শিক্ষিত মূর্খ সর্বস্তরের মানুষের নিকট এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বললে মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় এবং লোকসমাজে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সেই সাথে ভাষার উচ্চাঙ্গের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়। বানান যেমন সঠিক হওয়া দরকার উচ্চারণও তেমন বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে শহীদ রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম, সফিউরসহ অসংখ্য শহীদের রক্তের বিনিময় অর্জিত এ ভাষাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যভরে বিকৃত করে বিভিন্নভাবে ভুল উচ্চারণ ও উপস্থাপন করা হচ্ছে। যা ভাষার জন্য অমর্যাদাকর এবং ভাষাশহীদদের সাথেও প্রতারণার শামিল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও প্রকাশনা সংস্থা বানানের ক্ষেত্রে ভাষারীতি না মেনে যেমন ভাষাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করছে তেমন বলার ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে সিনেমা, নাটকে, বিভিন্নভাবে নিজেদের মনগড়া উচ্চারণ করছে। ফলে বাংলা ভাষার স্বকীয়তা আজ বিপন্ন। এগুলোতে অশ্লীলতার সাথে সাথে ভাষার বিকৃত উচ্চারণ যেন পাল্লা দিয়ে চলছে। বিশেষ করে এফ এম রেডিওগুলোতে বাংলা ভাষার উচ্চারণ রীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করছে। যা বাংলা ভাষার প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির জন্য চরম দুঃখজনক। কিন্তু এ বিষয়ে বাংলা একাডেমি, সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত সকলেরই নির্লিপ্ততা পরিলক্ষিত হয়। সংশ্লিষ্ট কার্যালয় ও ব্যক্তিবর্গ যতটা বিরোধীদলীয় নেতাকর্মী ও আলেম উলামাদের দমন নিপীড়ন, তথ্যসন্ত্রাসী, সিনেমার ক্ষেত্রে হিন্দি ও ইংরেজি সিনেমার সাথে পাল্লা দিয়ে অশ্লীলতা ছড়াতে ব্যস্ত ঠিক ততটা মাতৃভাষার উন্নতি, বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়। ইহাতে

> ইংরেজদের বিতাড়িত করে ভারত বিভাগের পর ভাষা সমস্যা ও ভাষা আন্দোলন এদেশের শ্রমিক, ছাত্র, জনতাকে যত আলোড়িত করেছে তা অন্য কোন সমস্যা বা আন্দোলন করেনি। ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের মায়ের মুখের ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি লাভ করে।

ভাষার লালিত্য যেমন বিনষ্ট হচ্ছে তেমন ভাষা শহীদদের অবমাননাও হচ্ছে। শহীদ মিনারে প্রভাত ফেরিতে ফুল না দিলেই শুধু শহীদদের অবমাননা করা হয় না। তার চেয়ে বেশি অবমাননা করা হয় যে ভাষার জন্য তাঁরা জীবন দিলেন তার যথেচ্ছা ও বিকৃত ব্যবহারের মাধ্যমে। কিন্তু শহীদ মিনার তৈরি ও ফুল দিতে আমরা যতটা যত্নশীল বিশুদ্ধ বলা ও উচ্চারণে আমরা এতটা নয়, যা খুবই দৃষ্টিকটু। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার তৈরির জন্য যেমন নির্দেশনা আছে তেমন, বাংলা ভাষা ব্যবহার, উচ্চারণের ক্ষেত্রেও মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। তা না হলে যেভাবে এফ এম রেডিওসহ বিভিন্ন প্রিন্টস ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়া আমাদের প্রিয় মাতৃভাষাকে বিকৃত করছে তাতে একসময় বাংলাভাষা তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলবে।

মাতৃভাষা বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা শুধু ব্যক্তিত্ব প্রকাশ ও ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধিই করে না বরং ইহা আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এর সুন্নাতও বটে। রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুকাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সর্বদা বিশুদ্ধ ভাষায় উত্তমরূপে কথা বলতেন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর মানুষের মধ্যে স্বীয় মাতৃভাষাপ্রেমী। তিনি হৃদয়ের সকল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছেন নিজ মাতৃভাষার প্রতি, আর শিক্ষা দিয়েছেন পৃথিবীবাসীকে স্ব-স্ব মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার জন্য। আল্লাহর নবীগণ ছিলেন নিজ নিজ যুগের সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং আধুনিক মানুষ। তা না হলে অন্য জাতির লোকেরা তাঁদেরকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করতেন না। আল্লাহ তা'য়ালা নবীদেরকে ঐসব গুণাবলীতে বিভূষিত করে পাঠিয়েছেন যেসব গুণাবলীতে সে জামানার লোকেরা অধিকতর উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। হযরত দাউদ (আ.) এর যুগের লোকেরা বেশি বিনোদনপ্রিয় ছিল। তারা সর্বদা গান-বাজনায় নিমগ্ন থাকত এবং সুর সাগরে ভেসে বেড়াত। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত দাউদ (আ.) কে বিশুদ্ধভাষী এবং সুমধুর সুর ও সুললিত কণ্ঠ দিয়ে নবী করে পাঠালেন। তিনি যখন আল্লাহর কালাম জাবুর পাঠ করতেন তখন শুধু পৃথিবীবাসীই নয় আকাশের উড়ন্ত পাখি থেমে যেত, চতুষ্পদ জন্তু, জঙ্গলের হিংস্র প্রাণী, পানির মাছ, কুমিরসহ সকল প্রাণী ডাঙায় উঠে এসে একত্রিত হয়ে তাঁর সুললিত কণ্ঠের আবৃত্তি শুনত। এমনকি জিন জাতি ও আকাশের ফেরেশতা পর্যন্ত।

ব্যাবিলন, সিরিয়া, লিবিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা ছিল বিত্তশালী, কারুনের অর্থ-সম্পদ তো রূপকথায় পরিণত হয়েছিল। শাদ্দাদ, ফিরাউন ও নমরূদের অর্থ সম্পদ ও রাজক্ষমতায় মানুষ ছিল বিমুগ্ধ ও নির্বাক। তাই আল্লাহ তা'য়ালা হযরত সুলাইমান (আ.)কে পাঠালেন পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষমতাশীল সম্রাট ও ধনকুবের করে।

হযরত মূসা (আ.) এর যুগে মিসরীয়রা ছিল যাদুবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী। যাদুর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ভীতিপ্রদ যাদু ছিল সাপ বানানো। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মূসা (আ.) কে দিলেন সাপ বানানোর ক্ষমতাসম্পন্ন লাঠি, আর মূসা (আ.) এর তোতলামি দূর করার জন্য উত্তম ব্যবস্থা। হযরত ঈসা (আ.) এর যুগে গ্রিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র ছিল বিশ্বখ্যাত। তাই আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ঈসা (আ.) কে দিলেন হাতের স্পর্শে অন্ধকে চক্ষু দান, টাকওয়ালাকে চুল দান, কুষ্ঠরোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় এবং মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা। আর নবী করীম (সা.) এর যুগে আরবের ভাষা ও কবিতার চর্চা উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। সাব আ-মু'য়াল্লাকা কালোত্তীর্ণ হয়ে আজও

মাতৃভাষা বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা শুধু ব্যক্তিত্ব প্রকাশ ও ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধিই করে না বরং ইহা আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এর সুন্নাতও বটে। রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুকাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সর্বদা বিশুদ্ধ ভাষায় উত্তমরূপে কথা বলতেন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর মানুষের মধ্যে স্বীয় মাতৃভাষাপ্রেমী। তিনি হৃদয়ের সকল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছেন নিজ মাতৃভাষার প্রতি, আর শিক্ষা দিয়েছেন পৃথিবীবাসীকে স্ব-স্ব মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার জন্য। আল্লাহর নবীগণ ছিলেন নিজ নিজ যুগের সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং আধুনিক মানুষ। তা না হলে অন্য জাতির লোকেরা তাঁদেরকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করতেন না। আল্লাহ তা'য়ালা নবীদেরকে ঐসব গুণাবলীতে বিভূষিত করে পাঠিয়েছেন যেসব গুণাবলীতে সে জামানার লোকেরা অধিকতর উৎকর্ষতা লাভ করেছিল।

শিল্পী, সাহিত্যিকদের বিস্ময় সৃষ্টি করছে। আরব্য উপন্যাসের চেয়ে চমকপ্রদ কাহিনী বিশ্বের অন্য কোন ভাষায় আজও সৃষ্টি হয়নি। আরবের লোকেরা কবিতায় হাসতেন, কবিতায় কাঁদতেন। কাব্যানুরাগী আরব সমাজের আবির্ভূত নবী (সা.) ছিলেন আরবের সবচেয়ে সুন্দর ও শুদ্ধভাষী। তাঁর প্রতি নাযিলকৃত গ্রন্থ শুধু ধর্মগ্রন্থই নয়, তা আরবি ভাষার উজ্জ্বলতম সাহিত্য ও শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থও বটে। নবী করিম (সা.) শুধু শুদ্ধ ভাষায় নয়, বিশুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলতেন। সারা জীবনে তিনি যেমন একটি মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করেননি তেমন অশুদ্ধ শব্দ বা বাক্যও উচ্চারণ করেননি। শিশুকালেও তিনি শুদ্ধভাবে কথা বলতেন। তাঁর শুদ্ধ উচ্চারণ শুনে আরবের সাহিত্যিক ও পন্ডিতেরা আশ্চর্য হয়ে যেতেন। নবী করিম (সা.) কথায়, আচরণে, সংস্কৃতিতে, পোশাকে, পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও বিশুদ্ধ থাকা পছন্দ করতেন। তার চরিত্র যেমন ছিল নিষ্কলুষ তেমন ভাষাও ছিল শুদ্ধ এবং উচ্চারণ ছিল সুস্পষ্ট। ভাষার বিশুদ্ধতা এবং উচ্চারণের সুস্পষ্টতা নবী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

আল্লাহ তা'য়ালা নবী (সা.)কে প্রেরণ করেছেন আদর্শ হিসেবে, মুসলমানেরা রাসূল (সা.)কে ধর্মীয় ক্ষেত্রে আদর্শ মানে। আর পোশাক পরিচ্ছদে, চলনে, বলনে, আচার-ব্যবহারে, সংস্কৃতিতে ইহুদি, নাসারা, খ্রিষ্টানদের অনুসরণ করে আধুনিকতা মানে। অথচ রাসূল (সা.)-এর যুগে ইহুদি, খ্রিষ্টান, নাসারা, পৌত্তলিকতা নবী (সা.)কে রুচি, সংস্কৃতবান ও সৌন্দর্য চেতনার মাপকাঠি হিসেবে মেনে নিয়েছিল। যে সমস্ত গুণ একটি মানুষের ব্যক্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে তার মধ্যে রয়েছে শুদ্ধ ভাবণ, সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ। মহানবী (সা.) তাঁর মাতৃভাষা শুদ্ধভাবে বলতেন এবং সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন। মাতৃভাষা শুদ্ধভাবে বলা আমাদের প্রিয়নবী (সা.)-এর সুন্নাত। দাড়ি না রাখা, বাম হাতে পানাহার যেমন সুন্নাতের খেলাপ তেমন অশুদ্ধ ভাষায় কথা বলাও সুন্নাতের খেলাপ। অনেকে বলেন আরবি অশুদ্ধ বলা সুন্নাতের খেলাপ; অন্য ভাষা অশুদ্ধ বলা সুন্নাতের খেলাপ নয়। ইহা প্রকৃতই ভুল ধারণা। কেননা আমাদের নবী (সা.) ডান হাত দিয়ে খেজুর খেয়েছেন তাই বাম হাত দিয়ে খেজুর খাওয়া সুন্নাতের বরখেলাপ, আম, লিচু, কলা ইত্যাদি বাম দিয়ে খাওয়া সুন্নাতের বরখেলাপ নয়, তাহলে তা হবে মারাত্মক ভুল। সুতরাং নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে শুদ্ধ উচ্চারণে বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলা রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত। এ ছাড়া শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার গুরুত্ব অনেক শ্রোতাদের ওপর বক্তৃতার প্রভাব অনস্বীকার্য। জনগণকে বুঝাতে হবে মাতৃভাষায় শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে। তা নাহলে মানুষের হৃদয় ও মন জয় করা সম্ভব নয়।

ইংরেজদের বিতাড়িত করে ভারত বিভাগের পর ভাষা সমস্যা ও ভাষা আন্দোলন এদেশের শ্রমিক, ছাত্র, জনতাকে যত আলোড়িত করেছে তা অন্য কোন সমস্যা বা আন্দোলন করেনি। ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের মায়ের মুখের ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে ভাষাশহীদদের পথ ধরেই আমাদের স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়। কিন্তু সে ভাষাকে এবং ভাষাশহীদ ও সৈনিকদেরকে আমরা যথাযোগ্য মর্যাদা না দিয়ে শুধু দিবস পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। বাংলাদেশের অস্থির ও প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতির কারণে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আজও যথার্থভাবে জাতির সামনে উপস্থাপিত হয়নি। মহান ভাষা আন্দোলনে ছাত্র-জনতার পাশাপাশি শ্রমিকরাও রাজপথের কালো পিচে এবং সবুজ শ্যামল এই বাংলাদেশের মাটিতে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে রক্তে রঞ্জিত করেছেন। শুধু তারা রক্তই দেননি বরং অনেকেই শাহাদাতের নজরানা পেশ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। পৃথিবীর অন্যান্য আন্দোলনের ন্যায় ভাষা আন্দোলনের বিজয়েও শ্রমিকদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। কিন্তু শাসকদের অহমিকা, মিথ্যারবেসাতি, দলীয় সংকীর্ণতা ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির কারণে ভাষা আন্দোলনে শ্রমিকদের মূল্যায়ন আজ অবধি করা হয়নি। এমনকি এদেশের সাংবাদিক, লেখক ও প্রিন্ট অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াও বাস্তব চিত্র তুলে ধরেনি। আমাদের ভাষা সৈনিকদের মধ্যে অনেকেই ছিল শ্রমিক। কিন্তু তাদের নাম সংগীতে, বক্তব্যে বললেও তাদের মূল পরিচয় আড়ালেই থেকে যায়। ভাষা আন্দোলনে যারা শহীদ হয়ে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন ভাষাশহীদ আব্দুল জব্বার। তিনি একজন সাধারণ শ্রমিক ছিলেন। আব্দুস সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন রেকর্ড কিপার ছিলেন। আব্দুল আওয়াল ছিলেন একজন রিক্সশ্রমিক। ওয়ালি উল্লাহ ছিলেন শিশুশ্রমিক। এ ছাড়াও আরো কত শ্রমিক শহীদ হয়েছেন এবং কত শ্রমিক জেল জুলুমের শিকার হয়েছেন এবং কতজন আহত ও পঙ্গু হয়ে দুর্বিষহ জীবন যাপন করেছেন তা জানার চেষ্টা কেউ করেনি। তা আমাদের অজানাই রয়েছে।

'৫২ ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রকে বহিষ্কার করে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করে আবার অনেকের শাস্তির ব্যবস্থা করে। এর প্রতিবাদে সেদিন সর্বপ্রথম বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তুলে বগুড়ার রাজপথ প্রকম্পিত করেছিলেন বগুড়ার বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা। তাদের এ আন্দোলনের জের ধরেই পরবর্তীতে নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুটমিলের শ্রমিকরা এতে যোগ দেন। তারা ছাত্র জনতার পাশাপাশি ভাষা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেন। শুধু তাই নয় পাবনার হোসিয়ারি শ্রমিকরা এবং চট্টগ্রামের ডক শ্রমিকরা এ আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলে ফুঁসে ওঠেন সারা দেশের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার শ্রমিকরা। ছাত্রজনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হয় শ্রমিকরা এবং তাদের সংগ্রামের ফসল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে আমার মায়ের মুখের ভাষা বাংলা রাষ্ট্র ভাষা। পরবর্তীতে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে গোটা বিশ্ব একসাথে এ দিবস উদযাপন করে থাকেন। অথচ কেউ শ্রমিকদের এ অবদান মূল্যায়ন করেনি। চাপা পড়ে আছে তাদের ত্যাগ ও কুরবানি। কেউ কথা বলে না তাদের অধিকার নিয়ে। তাই আগামী প্রজন্মের কাছে শ্রমিকদের অবদান যথার্থভাবে তুলে ধরতে এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শাসকগোষ্ঠী, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। সেই সাথে আমাদের সকলেরই উচিত বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাত পালন করা এবং নিজের ব্যক্তিত্বকে অর্থবহ ও প্রস্ফুটিত করে তোলা। আর ভাষাশহীদদের ত্যাগের প্রকৃত মর্যাদা দেয়া এবং বাংলা ভাষাকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করে সকল ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বাংলাভাষা প্রচলনের আপ্রাণ চেষ্টা করা।

লেখক: প্রভাষক, প্রাবন্ধিক, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও সভাপতি, নাটোর জেলা, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
zhaque274@gmail.com

শ্রমিক আন্দোলনে পেশাভিত্তিক নেতৃত্ব অপরিহার্য

এস এম লুৎফর রহমান

শ্রমিক আন্দোলন বলতে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রমকে বুঝায়। ট্রেড ইউনিয়ন হলো সংশ্লিষ্ট পেশার সমিতি বা সংঘ। পেশায় নিয়োজিত লোকদের সাম্য, মর্যাদা, স্বার্থ, ন্যায্য অধিকার রক্ষার যে সংগঠন গড়ে উঠে তাকে ট্রেড ইউনিয়ন বলে।

আভিধানিক ভাবে বলা হয়েছে- নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত একই পেশার লোকের সংঘ হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন। শ্রমিকের সাথে শ্রমিকের অথবা মালিকের সাথে মালিকের অথবা মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ মূলক শর্ত আরোপের জন্য গঠিত শ্রমিক/ মালিকের সংঘকে বুঝাবে।

শ্রমিক ময়দানে ট্রেড ইউনিয়ন করতে হলে সংশ্লিষ্ট পেশার সাথে যুক্ত থাকাটা জরুরি। কারণ প্রত্যেক পেশার ভিন্ন ভিন্ন ধরন বিদ্যমান। পেশা ভিত্তিক আইনের ভিন্নতা রয়েছে। একজন শ্রমিক যে পেশায় কর্মরত সেই আইন, বিধান এবং নিয়মেই তাকে কর্ম সম্পাদন করতে হয়। কর্মকালীন সময়ে বঞ্চিত শ্রমিকের পক্ষে ভূমিকা রাখতে হলে সেই শ্রমিকের কর্মের পরিবেশ, ধরন, আইন, বিধি-বিধান সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। সর্বোপরি ঐ পেশায় কর্মরত না হলে অথবা কর্মরত প্রতিষ্ঠানে অবাধ যাতায়াতের সুযোগ না থাকলে শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্ব দেয়া দুরূহ হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলন পেশা ভিত্তিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রভাব বলয়ের আন্দোলন বিদ্যমান। রাজনৈতিক নেতারা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিকদের ব্যবহার করে এবং ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। যার কারণে রাজনৈতিক কর্মীরা তাদের নেতাদের পক্ষে ট্রেড ইউনিয়নে তাদের প্রভাব বলয় সৃষ্টির মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কুক্ষিগত করে ফেলে। এতে করে সাধারণ শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে।

যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল অথবা আইনে স্বীকৃত সেই অনুযায়ী এই আন্দোলন পরিচালিত না হওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে অপেশাদার শ্রমিক নেতৃত্ব। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিষ্ঠিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত একটি প্লাটফর্ম। এ প্লাটফর্মের সুফল শ্রমিকদের ঘরে তুলতে হলে সংশ্লিষ্ট পেশা থেকেই নেতৃত্ব তৈরি করা সময়ের দাবি।

বাংলাদেশে দল ভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনে বেশির ভাগই দলীয় আনুগত্যশীল হওয়ায় তারা সব সময় শ্রমিক স্বার্থের চেয়ে রাজনৈতিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়, এতে শ্রমিক স্বার্থ খর্ব হয়। এক পর্যায়ে এসব সংগঠন অথবা সংঘ থেকে শ্রমিকরা বিমুখ হয়ে পড়ে, যার ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন একটি শুধুমাত্র পেশা ভিত্তিক আন্দোলন হলেও এ আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে ব্যবহার করার জন্য অন্যতম দায়ী বামপন্থী রাজনৈতিক নেতারা। তারা নিরীহ শ্রমজীবী মানুষকে অধিকার আদায়ের কথা বলে মূলত নিজেদের ক্ষমতায়নের সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করে।

শ্রমিক রাজ কায়েমের স্বপ্ন দেখিয়ে দুনিয়ার মজদুর এক হও শ্লোগানে মালিকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে শ্রমিক মেহনতি মানুষকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করাই ছিল সমাজতান্ত্রিকদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিকরা শ্রমিক সমাজকে ব্যবহার করে একের পর এক রাষ্ট্র দখলে নিলেও দীর্ঘ প্রায় দেড় শতাধিক বছরেও শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর একমাত্র কারণ শ্রমিক আন্দোলনকে সমাজতান্ত্রিকদের রাজনৈতিক রূপদান এবং সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতা কর্তৃক শ্রমিকদের নেতৃত্ব দেয়া।

এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারী বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ জাতীয়তাবাদের আদর্শের অনুসারী বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি একইভাবে ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে শ্রমিক সংগঠন তথা ট্রেড ইউনিয়ন গুলোকে ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করে আসছে। তারা ক্ষমতায় গিয়ে ভোগ বিলাসী জীবন যাপন করে চলছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য জনক হলেও সত্যি শ্রমিক সমাজের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি।

অবশ্যই এক্ষেত্রে শ্রমিকের পক্ষ সেজে শ্রমিকদের নেতৃত্ব দেয়ার অভিনয় করা শ্রমিক নেতারা গাড়ি বাড়ির মালিক হয়েছেন অহরহ। শুধু তাই নয়, অনেকে এমপি, মন্ত্রী হওয়ার নজিরও রয়েছে। এসব স্বার্থপর রাজনৈতিক ও শ্রমিক নেতারা অসহায় শ্রমিকদের রক্ত, ঘামের বিনিময়ে একদিকে বিশাল বিত্তশালী হচ্ছেন অন্য দিকে কোটি বনি আদম ক্ষুধার্ত অবস্থায় অনাহারে জীবন নির্বাহ করছে। সাম্রাজ্যবাদী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও জাতীয়তাবাদের ধ্বজা ধারীরা শ্রমিক সমাজকে গোলামে পরিণত করে রেখেছে।

যেহেতু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের একমাত্র বৈধ ও আইনগত স্বীকৃত প্লাটফর্ম। এই প্লাটফর্মের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা রয়েছে। সেহেতু শ্রমিকদের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির স্বার্থে ট্রেড ইউনিয়ন গুলোকে রাজনৈতিক কালো থাবা থেকে মুক্ত করতে হবে। এর থেকে মুক্তির একটাই পথ তাহলো শ্রমিক সচেতনতা। শ্রমিকদের শত্রু কে, বন্ধু কে, কাদের কারণে যুগ-যুগান্তরে শ্রমিকরা বঞ্চিত হয়ে আসছে তা বিবেচনায় আনা সময়ের দাবি।

অতএব, যাদেরকে নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন হয়, যেসব পেশার শ্রমিকদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয় তাদের থেকেই নেতৃত্ব নির্বাচন করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বৃহৎ প্লাটফর্ম যেহেতু ফেডারেশন সেহেতু বেসিক ট্রেড ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, শ্রমিকের প্রতি পরীক্ষিতদেরই ফেডারেশনের নেতা বানানো প্রয়োজন।

পেশাজীবীরা যদি শ্রমবিধি অনুসারে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুযোগ্য ও আমানতদার নেতৃত্ব গঠনে সংশ্লিষ্ট পেশা থেকে নেতা নির্বাচন করে তাহলে শ্রমিকের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সফলতার মুখ দেখবে। আসুন" পেশা আমার, নেতৃত্ব আমাদেরই" রাজনীতির জন্য শ্রমিক আন্দোলন নয়, বঞ্চিতদের স্বার্থ রক্ষায় হোক শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন।

লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম মহানগরী, বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশন

ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার

ফখরুল ইসলাম খান

শান্তি ও মানবতাবাদী শাশ্বত বিধান ইসলামে শ্রমজীবী মানুষকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই শ্রমিকের অধিকার ও শ্রম আইনের পথপ্রদর্শক, পৃথিবীর সফল শ্রমিকনেতা, মানবতার বন্ধু ও মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদার কথা সবার উপরে তুলে ধরেছেন। ভাষণে তিনি বলেন- 'হে জনমণ্ডলী! শুনে রাখো, মুসলিম পরস্পর ভাই-ভাই, তোমাদের অধীন ব্যক্তিগণ, তোমাদের ভৃত্য! তোমরা নিজেরা যা খাবে, তা-ই তাদের খাওয়াবে, নিজেরা যা পরবে, তা-ই তাদের পরতে দিবে।'

মানবজীবনের উন্নতি, অবনতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি এমনকি অস্তিত্ব রক্ষাও নির্ভর করে পরিশ্রমের ওপর। শ্রম বিনিয়োগ ছাড়া কোন প্রাণীই প্রয়োজন মোতাবেক রিজিক পায় না। শ্রম বিনিয়োগ ছাড়া সুন্দর জীবন আশা করা বৃথা। কেউ শারীরিক পরিশ্রম করে, কেউবা মানসিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে জীবিকা অর্জনের পাশাপাশি দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণ সাধন করে যাচ্ছেন। কাজ যে ধরনেরই হোক না, তা কাজ বা শ্রম। অতএব যে লোক, যে স্তরেই শ্রম বিনিয়োগ করুন না কেন তিনিই শ্রমিক।

শান্তি ও মানবতাবাদী শাশ্বত বিধান ইসলামে শ্রমজীবী মানুষকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই শ্রমিকের অধিকার ও শ্রম আইনের পথপ্রদর্শক, পৃথিবীর সফল শ্রমিকনেতা, মানবতার বন্ধু ও মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদার কথা সবার উপরে তুলে ধরেছেন। ভাষণে তিনি বলেন- 'হে জনমণ্ডলী! শুনে রাখো, মুসলিম পরস্পর ভাই-ভাই, তোমাদের অধীন ব্যক্তিগণ, তোমাদের ভৃত্য! তোমরা নিজেরা যা খাবে, তা-ই তাদের খাওয়াবে, নিজেরা যা পরবে, তা-ই তাদের পরতে দিবে।'

ঐতিহাসিক এ ভাষণে উপস্থিত এবং অনুপস্থিত পরবর্তী তাঁর অনুসারীদের জন্য শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে রেখে গেলেন ঐতিহাসিক এক দলিল।

যার শ্রম বিনিয়োগ যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, কিংবা যিনি যে ধরনের শ্রমিকই হোন না কেন তার শ্রমের যেমন গুরুত্ব আছে তেমনি সেই শ্রমিকেরও মর্যাদা আল্লাহ ও সৃষ্টির কাছে অপরিসীম। আদি পিতা আদম (আ.) এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)সহ সকল নবী ও রাসূলগণই নিজ হাতে কাজ করে জীবিকা উপার্জন করেছেন।

শ্রমিকের মর্যাদা

শ্রমজীবী মানুষ বর্তমানে কঠিন সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ। আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা তাদেরকে সীমাহীন কষ্ট এবং সমস্যায় নিমজ্জিত করে রেখেছে। একদল মানুষ তাদের এ সমস্যাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়, তাদের আসল উদ্দেশ্য এদের সমস্যা দূর করা নয়, বরঞ্চ এদের সমস্যা আরো বৃদ্ধি করা এবং এদেরকে আরো অধিক দুঃখ কষ্টে নিমজ্জিত করা। এদের কোন সমস্যা দূর করা সম্ভব হলেও তা দূর না করে বরং এদের দুঃখ কষ্ট আরো বৃদ্ধি করে এবং তাদের উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে ঠেলে দিয়ে আইন-শৃঙ্খলার বিধিবন্ধন চুরমার করে দিয়ে তাদেরকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য।

শ্রম ও শ্রমিকদের প্রধান সমস্যা হলো তাদের সামাজিক মর্যাদা। আধুনিক সমাজে বর্তমানের বিজ্ঞানোজ্জ্বল শিক্ষিত সমাজে শ্রমিকদের শ্রমকে নিতান্ত অপমানকর কাজ বলে বিবেচিত হয়। সাধারণত শ্রমিকদের সামাজিক কোনরূপ মর্যাদা দেয়া হয় না। তাদেরকে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত বলে মনে করা হয়। ইসলাম সর্বপ্রথম কৃত্রিম আভিজাত্যবোধ ও সামাজিক বৈষম্যের উপর কঠোর আঘাত করতে বাধ্য হয়। ইসলাম মানুষের মধ্যে শুধু প্রকৃত সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধই সৃষ্টি করেনি বরং কার্যকরভাবে শ্রমজীবী ও খেটে খাওয়া মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল কাজে, হালাল পথে শ্রম এবং হাড়ভাঙা পরিশ্রম করা লজ্জাকর বিষয় নয়। শ্রম বিনিয়োগ করাকে সামাজিকভাবে মর্যাদাহীন মনে করে না। কারণ ইসলামের প্রত্যেক নবী শারীরিক পরিশ্রম করেই জীবিকা উপার্জন করেছেন বলে কুরআন-হাদিস থেকে প্রমাণিত।

আল কুরআনে শ্রম সম্পর্কীয় বক্তব্য :

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা তার কার্য অনুযায়ী হয়। আর তোমার রব মানুষের কাজের ব্যাপারে বেখবর নন।
(সূরা আনআম : ১৩২ আয়াত)

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ

এবং আমার তত্ত্বাবধানে আমার অহি অনুযায়ী একটি নৌকা বানানো শুরু করে দাও। আর দেখো যারা জুলুম করেছে তাদের জন্য আমার কাছে কোন সুপারিশ করো না, এরা সবাই এখন ডুবে যাবে। (সূরা হুদ : আয়াত ৩৭)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

আর স্মরণ করো, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এই গৃহের প্রাচীর নির্মাণ করছিল, তারা দোয়া করে বলছিল : "হে আমাদের রব! আমাদের এই খিদমত কবুল করে নাও। তুমি সবকিছু শ্রবণকারী ও সবকিছু জ্ঞাত। (সূরা বাকারা আয়াত ১২৭)।

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

মেয়ে দু'জনের একজন তার পিতাকে বললো, "আব্বাজান! একে চাকরিতে নিয়োগ করো, কর্মচারী হিসেবে ব্যক্তিই উত্তম হতে পারে যে শক্তিশালী ও আমানতদার।" (সূরা কাসাস : আয়াত ২৬)।

সমস্ত নবী ও রাসূলগণ ছাগল চরানো, পানি উঠানো, নৌকা তৈরি, পোশাক তৈরি, প্রাচীর নির্মাণসহ প্রায় সকল শ্রমের সাথে জড়িত ছিলেন। আল কুরআনে বিভিন্ন সূরায় এসব ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, সূরা আল বাকারা : ২৮, সূরা মায়েদা : ৩, ৩১, ১১০ ও ১১১, সূরা নুর : ৫৫, সূরা আরাফ : ২৬, ৭৪, ও ১৪৮, সূরা শুআরা : ১৪৯, সূরা ত্বোয়াহা : ১২১, সূরা কাহাফ : ৭৭, ৭৯, ৯৪ ও ৯৭, সূরা আম্বিয়া

মালিক পক্ষ বেশি মুনাফা অর্জনকেই জীবনের মূল লক্ষ্য বানানোর কারণেই শ্রমিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। তারা শ্রমিককে কম মজুরি দিয়ে বেশি শ্রম নিতে বাধ্য করে। শ্রমিকরা তাদের জীবন বাঁচাতে গিয়ে বাধ্য শ্রম দিতে। তাদের এই অসহায়ত্বকে শোষণের সুযোগ মনে করে মালিক পক্ষ বেশি মুনাফা অর্জন করতে চায় এবং তারাই শ্রমিক সমস্যা সৃষ্টি করে। চলমান অর্থ-শিল্প শ্রমনীতিতে ইনসাফপূর্ণ ও ভারসাম্যমূলক বণ্টনব্যবস্থা নাই।

: ৮০ ও ৮২, সূরা সাবা : ১০, ১১, ১২ ও ১৩, সূরা সাদ : ৩৬ ও ৩৯, সূরা রায়াদ : ১৭, সূরা কাসাস : ২৪ ও ৩৮, সূরা নামল : ৪৪, সূরা সফ : ১৩, সূরা তাওবা : ১৯, সূরা নাহল : ১৪, ৮০, ও ৯২, সূরা ফাতের : ১২, সূরা আনকাবুত : ৪, সূরা হুদ : ৬৯, সূরা ইউসুফ : ৩৬। আমরা যদি কুরআন-সুন্নাহকে অনুসরণ করে সঠিকভাবে শ্রম বিনিয়োগ করতে পারি তাহলেই শ্রমের মর্যাদা পেতে পারি। কাজের ভিত্তিতে মর্যাদা পাওয়া যাবে। অলস ও কাজ না করা ব্যক্তিদের জন্য না দুনিয়ায় কোন সুখ আছে না আখেরাতে।

শ্রমিক সমস্যার মূল কারণঃ মালিক পক্ষ বেশি মুনাফা অর্জনকেই জীবনের মূল লক্ষ্য বানানোর কারণেই শ্রমিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। তারা শ্রমিককে কম মজুরি দিয়ে বেশি শ্রম নিতে বাধ্য করে। শ্রমিকরা তাদের জীবন বাঁচাতে গিয়ে বাধ্য শ্রম দিতে। তাদের এই অসহায়ত্বকে শোষণের সুযোগ মনে করে মালিক পক্ষ বেশি মুনাফা অর্জন করতে চায় এবং তারাই শ্রমিক সমস্যা সৃষ্টি করে। চলমান অর্থ-শিল্প শ্রমনীতিতে ইনসাফপূর্ণ ও ভারসাম্যমূলক বণ্টনব্যবস্থা নাই। মানবরচিত আইন ইনসাফপূর্ণ ও ভারসাম্যমূলক হতে পারে না। আর যেহেতু একমাত্র ইসলামেই কল্যাণমূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলাম ও মানবরচিত অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর (রহ) চমৎকার একটি তুলনা করেছেন। তিনি বলেন- অর্থনৈতিক কল্যাণের চেয়ে মানবিক কল্যাণ অধিক গুরুত্বের দাবি রাখে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সবচেয়ে বড় যুলুম হচ্ছে, তা শ্রমিক শ্রেণীকে কলুর বলদ বানিয়ে তাদের কাছে মানবতা ছিনিয়ে নেয়। বর্তমানে যেখানেই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা চালু আছে, মানুষের ওপর এ রকম উৎপীড়ন চালানো হচ্ছে। ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত হলে তা শুধু যে শ্রমজীবী মানুষকে অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী করতে সচেষ্ট হবে তাই নয়, বরং এ রাষ্ট্র ব্যবস্থা চায়, সমাজের সচ্ছল মানুষদের মতো তারাও সুখী

জীবন-যাপন করুক। ইসলামী রাষ্ট্র বৈধ শ্রম এবং ইনসাফভিত্তিক পারিশ্রমিকের নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করবে এবং শ্রমিকদেরকে ঐ পরিমাণ সময় দেয়া হবে যে, তারা তাদের কাজ শেষ করার পর নিজ পরিবার ও সন্তান-সন্ততিদের প্রতি মনোযোগী হতে পারবে। নিজের ও পরিবারের নৈতিক মানোন্নয়নের কাজও করতে পারবে।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- যুগ যুগ ধরে সমাজের নেতৃত্বশীলরা আর্থিক ও মানবিক দুর্বলতার কারণে তাদের অধীনস্থ শ্রমিকদেরকে জুলুম, নির্যাতন ও শোষণ করে আসছেন। শ্রমিকদেরকে যথাযথ মর্যাদা ও মূল্যায়ন না করে ক্রমান্বয়ে দাসে পরিণত করেছেন। তাদের সাথে পশুর মতো আচরণ করতেন। সুযোগ পেলেই মালিকেরা শ্রমিকের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতেন। শ্রমিকদের ছিলো না নূন্যতম মর্যাদা ও অধিকার। অসহায় খেটে খাওয়া শ্রমিকদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়ে মালিকেরা অর্জন করতেন সম্পদের পাহাড়। সপ্তাহে ১০ থেকে ১৪ ঘন্টা অমানবিক পরিশ্রম করে নির্যাতিত শ্রমিকদের মিলতো সামান্যতম পারিশ্রমিক। এছাড়াও টানাপড়েনের সংসার জোড়াতালি দিয়ে চালাতে হিমশিম খেতে হতো। পরিবারের সদস্যদের মুখে তিন বেলা দূরে থাক ঠিকমত এক বেলা খাবার তুলে দিতে পারাটা ছিলো কষ্টসাধ্য। রাত্রিবেলা মাথা গুঁজানোর জন্য ছিলো না পর্যাপ্ত ও উপযোগী বাসস্থান। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেড়ে ওঠার কারণে সদস্যদের রোগ-ব্যাধি ছিলো তাদের জন্য মরাণব্যধির মতো। দিন-রাত্রে ১৬-১৮ ঘন্টা অক্লান্ত পরিশ্রমের পরেও তাদের জন্য নির্ধারিত কোন ছুটি ছিলো না। সব কিছু মিলিয়ে বলা যায়- শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনটা ছিলো বঞ্চিত, নির্যাতিত ও বিভীষিকাময়।

'মে দিবস' নামকরণেই শ্রমিকদের সাথে উপহাস:

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন দিবস নেই যে, তার মূল ঘটনার সাথে মিল রেখে দিবসটির নামকরণ করা হয়নি। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে 'মে দিবস'। এই দিবসটির নামকরণের সময় অত্যন্ত কৌশলী ভূমিকা গ্রহণ করা হয়েছে যা স্পষ্ট বলা যায় শ্রমিকদের প্রতি উপহাস বা প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়েছে!

আমরা যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যায় ভাষার আন্দোলন করার কারণে ভাষাদিবস, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার কারণে স্বাধীনতা দিবস, সংগ্রাম করে বিজয় অর্জন করার কারণে বিজয় দিবস ইত্যাদি। আশ্চর্য কথা : যে শ্রমিকরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করে রক্তে রাজপথ লাল করে জীবন বিলিয়ে তাদের অধিকার আদায় করলেও নামকরণের ক্ষেত্রে প্রতারিত হতে হয়েছে। মে দিবস না হয়ে হওয়া উচিত ছিলো "আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস"। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এ দিবসটিকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।

মে দিবসের ইতিহাস

আমরা জানি, এমনি এক প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক মে দিবসের জন্ম। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত অধ্যায়। উনবিংশ শতাব্দীর ১৮৩০-১৮৪৭ সালে এই আন্দোলনের গোড়া পত্তন হয়। ১৮৩৬ সালে সর্বপ্রথম শ্রমিক আন্দোলন আন্তর্জাতিকতা লাভ করে। ১৮৩৮ সালে লোভেট শোষিত শ্রমিক সমাজের মুক্তির জন্য লন্ডনে একটি সম্মেলন আহবান করার কারণে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। এর অল্পকাল পরে কার্লমার্কস, এঞ্জেলস ১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট ম্যানি ফ্যাস্টো প্রকাশ করেন -যার দুনিয়া কাঁপানো শ্লোগান ছিলো- "দুনিয়ার মজদুর এক হও"। ১৮৪৮-১৮৮৯ সালকে শ্রমিক আন্দোলনের ২য় পর্যায় বলা যায়। ১৮৬০ সালে ইতালি, জার্মানি ও রাশিয়াতে রাজনৈতিক সংস্কার শুরু হয়। ১৮৬৪ সালে পশ্চিম ইউরোপের প্রধান কয়েকটি দেশের শ্রমিকনেতারা লন্ডনের সেন্টমার্টিন হলে মিলিত হয়ে "আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ" একটি সংগঠনের জন্ম হয়।

১৮৭০ সালে প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণী বর্জোয়া শাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করে "প্যারিস কমিউন" নামে খ্যাত। ১৮৭২ সালে আন্তর্জাতিক সদর দপ্তর লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্কে স্থানান্তরিত হয়। অবশেষে ১৮৭৬ সালে এই আন্তর্জাতিক সংঘের পরিসমাপ্তি ঘটে। ইতোমধ্যে ব্রিটেনে ১৮৬৯ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও ১৮৮০ সালে আমেরিকায় "আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবার" এর মতো বেশ শক্তিশালী জাতীয় ভিত্তিক শ্রমিক সংগঠনের জন্ম ঘটে। অতঃপর ১৮৮৪ সালের ৭ই অক্টোবর এএফএল ঘোষণা করলো ১৮৮৬ সালের ১লা মে থেকে ৮ ঘন্টা কাজের সময় গণ্য করা হবে। এর আগে মালিক পক্ষ শ্রমিকদের ১৫-১৬ এমনকি ১৮ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য করতো।

মে দিবস শ্রমিক শপথের দিন

১৮৮৬ সালের ১লা মে দিনটি ছিলো শনিবার। এর আগে আমেরিকায় ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে আন্দোলন বেশ সক্রিয় হয়ে গেছে। ১লা মের আগের রোববার শিকাগো শহরে ২৫ হাজার শ্রমিকের বিরাট সমাবেশ হয়ে গেল। ১লা মে হাজার হাজার শ্রমিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে ডাকা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। শ্রমিকশ্রেণীর এই ঐক্যবদ্ধতাকে সুনজরে দেখেনি শোষিত শাসকগোষ্ঠী। ২রা মে রোববার সরকারি ছুটির দিনের শ্রমিক সমাবেশে উপস্থিতি বেশি হয়। বক্তব্য রাখেন শ্রমিকনেতা এলবার্ট আর পার্সনস। ৩রা মে ম্যাককমিক বিপার কারখানার ধর্মঘটি শ্রমিকদের সমাবেশে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। নিহত হয় ৬ জন আহত অজস্র। ৪ঠা মে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে শিকাগোর হে মার্কেট স্কয়ারে লাখো মানুষের বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিকরা জীবন বাজি রেখে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। সংঘর্ষে ৪ শ্রমিক ও ৭ পুলিশ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সারা মার্কেট রক্তে লাল হয়ে গেল। একজন কিশোর শ্রমিক তার গায়ের শার্ট খুলে রক্তে ভিজালো। রক্তে ভেজা লাল জামাটা উড়িয়ে নিলো পতাকা হিসাবে। আর সেই পতাকাই আজ শ্রমিক শ্রেণীর লাল ঝাণ্ডা সংগ্রামের অনুপ্রেরণা।

এরপর মামলা হয় দীর্ঘদিন চলার পর ১৮৮৬ সালের ৯ই অক্টোবর মামলার রায়ে শ্রমিক ৪ জনের ফাঁসি ৩ জনের যাবজ্জীবন সাজা হয়। এতে শ্রমিক শ্রেণী উত্তেজিত হয়েও কোন লাভ হয়নি। ১৮৮৭ সালের ১২ই নভেম্বর বীর শ্রমিকনেতাদের ফাঁসি কার্যকর করে শোষিতদের দল। এরপরও শ্রমিকনেতারা থেমে থাকেননি তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন থেকে। অবশেষে ১৯১৯ সালে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে গঠিত হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)।

বিশ্বের ইতিহাসে শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত শ্রমিকেরা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে একমাত্র বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শ্রমিকের বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনীত আদর্শেই সম্ভব। ইসলামী বিধান অনুযায়ী কাজের বিনিময়ে মজুরি বা পারিশ্রমিক লাভ করা শ্রমিকের অধিকার। ব্যক্তি স্বাধীনতা, শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা লাভ করা শ্রমিকের নাগরিক মৌলিক অধিকার। শ্রমিকের এ অধিকার ন্যায়সঙ্গত ও ইনসাফপূর্ণ হতে হবে। ইসলামে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণে ন্যায়বিচার, দুষ্প্রাপ্যতা ও মানবতার নীতিগুলো অবশ্যই অনুসরণযোগ্য এবং সবার জন্য কল্যাণকর।

লেখক : সভাপতি, সিলেট জেলা দক্ষিণ, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ছক্কা ছয়ফুরের বাবুর্চি থেকে প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন

অ্যাডভোকেট ইয়াসীন খান

> ১৯৮১ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে ছয়ফুর রহমান প্রথম জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি ৬০-৬৫ জন প্রার্থীর মাঝে আট নম্বর হয়েছিলেন। তারপর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "আমি দেশের আট নম্বর প্রেসিডেন্ট। ইলেকশনের দিন বাকি সাতজন মারা গেলে আমি প্রেসিডেন্ট হতে পারতাম।"

বাংলাদেশের এক অসাধারণ শ্রমিকের গল্প বলবো! নাম তাঁর ছয়ফুর রহমান। শ্রমিক হওয়ার পরও মানুষের মন জয় করার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি। পেশায় ছিলেন সাধারণ বাবুর্চি। সিলেট শহরতলির সালুটিকর গ্রাম্য বাজারের পাশে ছাপরা ঘরের চা স্টল টাইপের খাবার হোটেল বাবুর্চি। বাবুর্চির কাজের পাশাপাশি দ্বিতীয় পেশা ছিল ঠেলাগাড়ি চালনা। যখন বাবুর্চিগিরি করে আয় রোজগার হতো না তখন ঠেলাগাড়ি চালাতেন। ছয়ফুর রহমান হাস্যরসে ভরপুর আপাদমস্তক একজন শ্রমিক নেতা হলেও তিনি ছিলেন অসম সাহসী এক বীর মুক্তিযোদ্ধা।

তিনি স্বপ্ন দেখতেন মানুষকে নিয়ে, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ে। নিজের মতো করে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার চিন্তা করতেন। সমাজের নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে ছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। অসম সাহস নিয়ে যেকোন যৌক্তিক বিষয়ে একা একা আন্দোলন শুরু করে ছন্দ ও কৌতুকের ছলে সাধারণ মানুষকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে সমর্থ হতেন। তার কাজে মানুষের আস্থা তৈরি হতো এবং প্রত্যেক ইস্যুতে তিনি জনসম্পৃক্ত আন্দোলন করতেন। বাস ভাড়া বৃদ্ধি বা অন্যান্য যেকোন ইস্যুতে জনগণের কথা চিন্তা করে ছয়ফুর রহমান সিলেটের কোর্ট পয়েন্টে একটা মাইক বেঁধে নিয়ে বিকেলে প্রতিবাদ সভা করবেনই করবেন।

আল্লাহর গোলাম মোঃ ছয়ফুর রহমান বলে নিজেকে পরিচয় দিতেন– ইউপি চেয়ারম্যান থেকে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত প্রত্যেক পদে জনপ্রতিনিধি হওয়ার জন্য নির্বাচন করেছেন। এমপি থেকে রাষ্ট্রপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান পদে লড়াই করে বিজয়ী হতে না পারলেও তিনি উপজেলা চেয়ারম্যান ঠিকই নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার নির্বাচনে অংশগ্রহণ জনগণের মধ্যে হাস্যরসের পাশাপাশি ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করতো কারণ তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা। তার বক্তব্য শুনার জন্য শ্রমজীবী, পথচারী ও সাধারণ মানুষ ভিড় জমাতেন। বক্তা হিসেবে অসম্ভব রসিক লোক ছিলেন। ছন্দ কবিতার সুরে সুরে বক্তৃতা করতেন। মূল ইস্যু নিয়ে অনেক রসিকতা করবেন; কিন্তু দাবি তার ঠিকই থাকবে।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরেই তিনি এক টুকরো কাপড় বের করে সামনে রাখতেন। তারপর সবাইকে সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় বলতেন, "আমি এই যে আপনাদের জন্য আন্দোলন করতেছি, আমার মাইকের খরচ দিবে কে? মাইকের খরচ দেন।" অদ্ভুত ব্যাপার হলো, কোনো দিনই মাইকের খরচ উঠতে দেরি হয়েছে এমনটা হয়নি। এক টাকা, দুই টাকা করে তার সামনের কাপড়টি ভরে উঠত। তারপর যখন প্রয়োজন মতো টাকা হয়ে যেত তখন মাইকের খরচ উঠে গেছে; তিনি তার কাপড়টি বন্ধ করে দিতেন।

তার নিজের লেখা অদ্ভুত কয়েকটি চটি সাইজের বই ছিল। এর মধ্যে "বাবুর্চি প্রেসিডেন্ট হতে চায়" এবং "পড় বুঝ এবং বল" এই দু'টি বই অন্যতম। বই বিক্রি করেও মাঝে মধ্যে জনসভার খরচ তুলতেন।

১৯৮১ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে ছয়ফুর রহমান প্রথম জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি ৬০-৬৫ জন প্রার্থীর মাঝে আট নম্বর হয়েছিলেন। তারপর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "আমি দেশের আট নম্বর প্রেসিডেন্ট। ইলেকশনের দিন বাকি সাতজন মারা গেলে আমি প্রেসিডেন্ট হতে পারতাম।" তখন দেশে সরাসরি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন। তো সব প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর নিরাপত্তার জন্যই সঙ্গে পুলিশ দেয়া হলো। ছয়ফুর তার নিরাপত্তার জন্য পুলিশ প্রত্যাখ্যান করে বললেন, "এদেরকে খাওয়ানোর সাধ্য আমার নাই।" তবু নির্বাচনী নিয়মের কারণে তাকে ন্যূনতম দুইজন পুলিশ সঙ্গে নিতে হয়েছিল। প্রচারণার সময় রিকশায় দুই পাশে দুইজন কনস্টেবল আর ছয়ফুর রহমান মাঝখানে উঁচু হয়ে বসে ঘুরে বেড়াতেন।

ছয়ফুর রহমানের নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল অদ্ভুত ও মজাদার। দেশের কোনো রাস্তাঘাট পাকা করার দরকার নেই! রাস্তা তুলে দিয়ে সেখানে খাল করে ফেলতে হবে! নদীমাতৃক দেশে সেই খাল দিয়ে নৌকায় লোকজন চলাচল করবে! খালের পানিতে সেচ হবে– সব সমস্যার সহজ সমাধান।

> ছয়ফুর রহমান থেকে ছক্কা ছয়ফুর বনে যাওয়ায় উপজেলা নির্বাচন করেছেন ১৯৯০। মজার ক্যান্ডিডেট হিসেবেই সকল নির্বাচনে প্রার্থী হলেও এবারের উপজেলা নির্বাচনে সিলেট সদর উপজেলায় উপজেলা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই নির্বাচন এখনো সিলেটের বিভিন্ন আলোচনায় রস জোগায়।

দুর্নীতি বিরোধী অঙ্গীকারে তিনি বলতেন ক্ষমতায় গেলে সিলেটের সুরমা নদীর উপরে বিশাল আকৃতির একটি দাঁড়িপাল্লা লটকানোর ওয়াদা করতেন। পাল্লার পাশে একটা অফিস খুলে একজন কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন; যার কাজ হবে সিলেটে কোনো অফিসার নিয়োগ হলে প্রথমে তাকে দাঁড়িপাল্লায় তুলে ওজন করে অফিসে রেকর্ড রাখবেন। বছর ছয় মাস পরে তাকে আবারও পাল্লায় উঠানো হবে। এতে যদি দেখা যায় তার ওজন বেড়েছে তাহলে নির্ঘাত বোঝা যাবে সিলেটের মানুষের কাছ থেকে ঘুষ খাইয়া বডি বানাইছে। তখনকার সময়ে ঘুষ ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের মারাত্মক ব্যাধি। তাই এই ঘুষের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা সোচ্চার ছিলেন।

ছয়ফুর রহমান ইসলামী সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি করতেন। এক ব্যক্তির এক দল নাম হলো "ইসলামি সমাজতান্ত্রিক দল"। নিজ দলে কোন সদস্য নিতেন না। এমনকি নিজের স্ত্রীকেও সদস্য করেননি। তিনি বলতেন, 'একের বেশি লোক হলেই দল দুইভাগ হয়ে যাবে।'

ছয়ফুর রহমান থেকে ছক্কা ছয়ফুর বনে যাওয়ায় উপজেলা নির্বাচন করেছেন ১৯৯০ সালে। মজার ক্যান্ডিডেট হিসেবেই সকল নির্বাচনে প্রার্থী হলেও এবারের উপজেলা নির্বাচনে সিলেট সদর উপজেলায় উপজেলা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই নির্বাচন এখনো সিলেটের বিভিন্ন আলোচনায় রস জোগায়।

যথারীতি ছয়ফুর রহমান প্রার্থী হয়েছেন। তার প্রতীক ডাব। তিনি একটা হ্যান্ডমাইক বগলে নিয়ে একা একা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। পোস্টার লিফলেট কিছুই নেই। কিন্তু বক্তৃতা তির্যক। বাকি প্রার্থীদেরকে তুলাধুনা করে ফেলছেন। এরকম এক সন্ধ্যায় সিলেটের টিলাগড়ে তার ওপর অন্য এক প্রার্থীর কয়েকজন পান্ডা হামলা করে বসল।

পরের দিন সেই খবর গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। সাধারণ মানুষ বিরক্ত হলো। আহা! একেবারেই সাধারণ একটা মানুষ, তার সঙ্গে গুণ্ডামি করার কী দরকার ছিল?

ওই দিন বিকালে স্কুল ছুটির পর প্রথম মিছিল বের হলো সিলেট পাইলট স্কুলের ছাত্রদের উদ্যোগে। মিছিল লালদিঘীর রাস্তা হয়ে বন্দরবাজারে রাজাস্কুলের সামনে আসার পর রাজাস্কুলের ছেলেরাও যোগ দিল। ব্যস, বাকিটুকু ইতিহাস। মুহূর্তেই যেন সারা শহরে খবর হয়ে গেল। সন্ধ্যার মধ্যেই পাড়া-মহল্লা থেকে মিছিল শুরু হলো ছয়ফুরের ডাব মার্কার সমর্থনে। একেবারেই সাধারণ নির্দলীয় মানুষের মিছিল। পাড়া মহল্লার দোকানগুলোর সামনে আস্ত আস্ত ডাব ঝুলতে থাকল। রিকসাওয়ালারা ট্রাফিক জ্যামে আটকেই জোরে জোরে 'ডাব, ডাব' বলে চিৎকার শুরু করে! সেই স্লোগান ম্যাক্সিকান ওয়েভসের মতো প্রতিধ্বনি হয়ে এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায় চলে যায়। অনেক প্রেস মালিক নিজেদের সাধ্য মতো এক হাজার, দুই হাজার পোস্টার ছাপিয়ে নিজেদের এলাকায় সাঁটাতে থাকলেন। পাড়া-মহল্লার ক্লাব-সমিতিগুলো নিজেদের উদ্যোগে অফিস বসিয়ে ক্যাম্পেইন করতে থাকল। অবস্থা এমন হলো যে, ছয়ফুর রহমানকে নির্বাচনী সভায় আনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়াই মুশকিল হয়ে গেল।

ছয়ফুর রহমান বীর মুক্তিযোদ্ধা হওয়ায় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ তাঁদের অফিস ছেড়ে দিল ছয়ফুরের নির্বাচনী প্রচার অফিস হিসেবে। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা তার নির্বাচনী জনসভার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু সেখানে আনতে হলেও আগে মূল অফিসে গিয়ে ৫০০ টাকা অ্যাডভান্স করে আসতে হয়, নইলে ছয়ফুর রহমান আসেন না! কারণ, তাঁর বাবুর্চিগিরি বন্ধ হয়ে গেছে। ফুলটাইম নির্বাচন করতে হলে সংসার খরচ দরকার। ছয়ফুর রহমানই একমাত্র প্রার্থী, যাকে তাঁরই নির্বাচনী জনসভায় নিয়ে আসার জন্য উল্টো টাকা দিতে হচ্ছে।

নির্বাচনী ফলাফলে সিলেটের জনগণ সব অবহেলা আর টিলাগড়ের সন্ত্রাসী হামলার জবাব দিতে একাট্টা হয়ে ডাব প্রতীকে ছয়ফুর রহমানকে ৫২ হাজার ভোট আর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী চাক্কা প্রতীকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ইফতেখার হোসেন শামীম পেয়েছিলেন ৩০ হাজার ভোট। বাকি সবাই জামানত বাজেয়াপ্ত। এক কেন্দ্রে ছয়ফুর রহমানের ডাব পেয়েছিল ১৮০০ এর বেশি ভোট! ওই কেন্দ্রে দ্বিতীয় স্থানে থাকা প্রার্থী একজন পান মাত্র ১ ভোট। আরও অবাক করা একটি ব্যাপার ঘটে নির্বাচনের দিন। প্রায় ভোট কেন্দ্রে জনগণ ডাব মার্কার ব্যালটের সাথে টাকাও ব্যালট বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়। নির্বাচনের পরে ছয়ফুর রহমানের নাম পড়ে গেল ছক্কা ছয়ফুর। তিনি হাসিমুখে সেই উপাধি মেনে নিয়ে বললেন, "নির্বাচনে ছক্কা পিটানোয় মানুষ এই নাম দিয়েছে।"

উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবে ছক্কা ছয়ফুর সফল ছিলেন। তাঁর মূল ফোকাস ছিল প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষা ঠিক করা। হুটহাট যেকোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাইমারি স্কুলে ঢুকে পড়তেন। শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলেই শোকজ করে দিতেন। সেই সময় প্রাইমারি স্কুলগুলো উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে ছিল অনেকটাই।

তবে ছয়ফুর রহমানকে চ্যালেঞ্জ নিতে হয় বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের কারণে। ইউনিয়ন পরিষদের দুর্নীতি বন্ধে তিনি ছিলেন আপসহীন। এতে ক্ষিপ্ত চেয়ারম্যানরা একজোট হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব দিলে যতদূর মনে পড়ে তাঁর উপজেলা চেয়ারম্যানশিপ স্থগিত করে মন্ত্রণালয়। পরে ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় এসে উপজেলা পরিষদ বাতিল করে দিলে ছক্কা ছয়ফুরের স্বল্পমেয়াদি জনপ্রতিনিধিত্বের ইতি ঘটে। এক নির্বাচনে খরচের জন্য তিনি কিছু টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচন কোনো কারণে হয়নি। কিন্তু ছয়ফুর জনগণের টাকা জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে সেই ঐতিহাসিক কোর্টপয়েন্টে আবার আসলেন। এসে বললেন, আপনারা তো আমাকে নির্বাচনে খরচ চালানোর জন্য কিছু টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু নির্বাচন হচ্ছে না; তাই আমি আপনাদের টাকাগুলো ফেরত দিতে চাই। লোকজন অনেক খুশি হয়ে বলল, আমরা টাকা ফেরত নিতে চাই না; এগুলো আপনি নিয়ে নিন।

অভাবের কারণে তিনি নৌকার মাঝিগিরিও করেছেন। শেষ জীবনে তিনি অসুস্থ ও অভাব অনটনের সঙ্গে যুদ্ধ করেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। সরকারিভাবে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করার জন্য জেলা প্রশাসক এর অফিসের সামনে অনশন করেও নজির সৃষ্টি করেন। বক্তৃতায় নিজেকে আল্লাহর গোলাম মোঃ ছয়ফুর বলে পরিচয় দেয়া ছক্কা ছয়ফুর আজ আর নাই। কিন্তু তাঁর কথাগুলো মানুষের অন্তরে রয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত নিউজ।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক, সিলেট মহানগরী, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

আজব দেশ!

পুরো বিশ্বে দুইশতের অধিক দেশ রয়েছে যাদের অধিকাংশের নাম আপনি একবারের জন্য হলেও নিশ্চয়ই শুনেছেন। তবে এর মাঝে এমনও কিছু অতি ছোট দেশও রয়েছে যাদের নাম আপনি এখনও পর্যন্ত শোনেননি। এমনও কিছু দেশ রয়েছে যার পুরো দেশটির আয়তন এতটাই ক্ষুদ্র যে, সেই দেশে কয়েকটি পরিবার বাস করে মাত্র! বিশ্বাস করা যায়? কিন্তু এটাই সত্য আজকের এই ফিচারে এমন দশটি দেশের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে যাদের অতি ক্ষুদ্র আয়তন এবং অতি নিম্ন জনসংখ্যা যা আপনাকে একেবারে অবাক করে দেবে! এই দেশের আয়তন ৪৫৯ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা মাত্র ২১,৩৪৭ জন! দ্যা রিপাবলিক অফ পালাউ (Palau) একটি দ্বীপভিত্তিক দেশে যা গড়ে উঠেছে ৩০০-এর বেশি বিভিন্ন আকৃতি এবং আয়তনের দ্বীপ নিয়ে। এই পৃথিবীর বুকে পালাউ খুবই দারুণ একটি জায়গা। এখানকার রেইন ফরেস্টে রয়েছে ভিন্নধর্মী গাছপালা এবং পাখি। সাথে এই জায়গা সংলগ্ন পানিতে বাস করে ১৩০ প্রজাতির বিপন্ন শার্ক। কিন্তু এই দেশের সবচেয়ে বেশি দর্শনীয় দেখার জায়গা হচ্ছে লেক, যেখানে রয়েছে প্রায় দুইলাখ (2 Million) জেলিফিশ। তবে হ্যাঁ, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সময়ের সাথে সাথে তাদের হুল ফোটানোর ক্ষমতা হারিয়ে গেছে।

নিউএ (Niue) ওশেনিয়ায় অবস্থিত খুবই ছোট একটি দ্বীপ। এই দেশের আয়তন ২৬১.৪৬ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১,১৯০ জন। এতো দারুণ দৃশ্য থাকা সত্ত্বেও এই দেশে ভ্রমণ খুব একটা জনপ্রিয় নয়। যে কারণে এই দেশ বাইরের দেশের দানের সাহায্যে চলে, বিশেষ করে নিউজিল্যান্ডের দানে। এই দেশের রাজধানী একটি গ্রাম যেখানে ছয়শর কিছু বেশি মানুষ বসবাস করেন। তবে এই দেশে রয়েছে তাদের নিজস্ব বিমান বন্দর এবং একটি সত্যিকারের সুপার মার্কেট, যা পুরো দেশে মাত্র একটিই!

সেইন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস (Saint Kitts and Nevis) এর আয়তন ২৬১ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৫২,৩২৯ জন! এই দেশটি মূলত দুইটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত: সেইন্ট কিটস এবং নেভিস। এই দেশের আয়ের মূল উৎস হলো ইকোনমিক সিটিজেনশিপ প্রোগ্রাম যেখানে অনুমতি দেয়া হয় যে, যে কেউ অন্তত ২৫০,০০০ ডলার বিনিয়োগ করতে পারবে লোকাল চিনি তৈরি কারখানায় এবং এভাবে সে সেইন্ট কিটসের নাগরিকত্ব পাবে। এই দেশের নাগরিকত্ব পাবার অন্য আরেকটি উপায় হলো, ৪০০,০০০ ডলারের সমপরিমাণ সম্পত্তি কিনে নেয়া। এই দেশের আয়তন মাত্র ৭৫ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা মাত্র ৩০ জন! এই মাইক্রোন্যাশন অবস্থিত রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার একই নামের একটি প্রদেশে। এই দেশটি আবিষ্কৃত হয়েছে লিওনার্দো ক্যাস্লির মাধ্যমে যে ঘোষণা দিয়েছিল তার ফার্মটি নতুন এবং স্বকীয়। যদিও এই দেশটি অন্য কোন স্টেটের কাছে পরিচিতি পায়নি, কিন্তু এই দেশের রয়েছে তাদের নিজস্ব মুদ্রা, স্ট্যাম্প এবং পাসপোর্ট। এই দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে দর্শনার্থীরা রয়েল হাইনেসের সৌন্দর্য দেখতে পান।

টুভাল্যু (Tuvalu) দেশটির আয়তন মোট ২৬ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১০,৯৫৯ জন। এই বিশ্বের অন্যতম ছোট এবং দরিদ্র একটি দেশ এটি। এই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো বেশি খারাপ হয়ে যেতো যদি না তারা ইন্টারনেট ডোমেইন কারো কাছে দিয়ে দিত, যেখান থেকে এই দেশে প্রতি বছরে লাখ লাখ টাকা আসে।

নাউরু (Nauru) দেশটির আয়তন ২১ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৯,৫৯১ জন। এই পৃথিবীর বুকে নাউরু হলো সবচেয়ে ছোট স্বাধীন এবং সবচেয়ে ছোট দ্বীপ। নাউরুতে অফিসিয়াল কোনো রাজধানী নেই এমনকি নেই কোনো ভালো যাতায়াতের ব্যবস্থাও এবং ২৫ মাইল রাস্তা শুধুমাত্র তাদের লোকাল গাড়ি চলাচলেই ব্যবহার করা হয়। আবহাওয়াগত সমস্যার কারণে এই দেশ দর্শনার্থীদের কাছে খুব বেশি জনপ্রিয়তা পায়নি। এই দেশের আরেকটি অন্যতম রেকর্ড হলো ওবেসিটিতে ভোগা মানুষের সংখ্যা। দেশের প্রায় ৭০% মানুষ ওবেসিটিতে ভোগে।

এই দেশের আয়তন মাত্র ৪.৯১ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৩১২ জন মাত্র! ইতালির এই মাইক্রোনেশন শাসিত হয় মার্সেলো ১ এর কঠিনতার মধ্য দিয়ে। দ্য প্রিন্সিপালিটি অফ সেবোর্গা একই নামের ফ্রেঞ্চ বর্ডারের কাছে একটি গ্রাম। অপরিচিত এই রাষ্ট্রের রয়েছে তিন জন সদস্য নিয়ে গঠিত তাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষা বাহিনী: একজন মিনিস্টার অফ ডিফেন্স এবং দুইজন বর্ডারগার্ড! অতি ক্ষুদ্র এই দেশের সর্বমোট আয়তন ০.০৫৫ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা মাত্র ৭ জন! স্বঘোষিত রিপাবলিক অফ মলসিয়া আবিষ্কৃত হয় কেভিন বঘ নামের একজনের কাছে। এই জায়গাটি অবস্থিত আমেরিকার নেভাডাতে। এর জনসংখ্যা মিস্টার বঘ সহ তার পরিবার নিয়ে। তার পরিবারে রয়েছে তিনটি কুকুর, একটি বিড়াল এবং একটি খরগোশ! এলসিয়ার রয়েছে নিজস্ব জাতীয় সঙ্গীত, নিজস্ব প্রতীক এবং নিজস্ব জাতীয় পতাকা। এমনকি এই দেশের রয়েছে নির্দিষ্ট এবং গুরুতর অপরাধের জন্য ডেথ পেনাল্টিও! এই রাষ্ট্রের রয়েছে নিজস্ব পাসপোর্ট এবং স্পেস প্রোগ্রাম। ২০১৭ সালের মে মাসে এই দেশের বয়স হয়েছে ৪০ বছর!

এই মালটার সর্বমোট ০.০১২ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১১৩,৫০০ জন। ভ্যাটিকান সিটি ছাড়াও এখানে অন্য আরেকটি খুব ছোট রাষ্ট্র রয়েছে রোম এলাকাতে, যার নাম হচ্ছে সোভরেইন মিলিটারি অর্ডার অফ মালটা! এই এলাকায় রয়েছে মাত্র তিনটি বিল্ডিং, যার দুইটি রোমে অবস্থিত এবং তিন নাম্বারটি মালটা দ্বীপে অবস্থিত। এই দেশের রয়েছে নিজস্ব মুদ্রা, স্ট্যাম্প, ওয়েবসাইট, গাড়ি নাম্বার এবং পাসপোর্ট। এই দেশটির সর্বমোট আয়তন ০.০০৪ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা মোট ২৭ জন মাত্র! অপরিচিত এই রাষ্ট্রটি একটি সাগরের প্ল্যাটফর্মটি কোস্ট অফ গ্রেট ব্রিটেন থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সিল্যান্ড শাসিত হয় স্বঘোষিত প্রিন্স রিজেন্ট দ্বারা এবং এখানে যে কেউ কাউন্ট, ব্যারন অথবা সর্দার এর তকমা পেতে পারে স্টেটের ওয়েবসাইট থেকে শুধুমাত্র কয়েকশ' ব্রিটিশ পাউন্ড দিয়ে!

সংগ্রহে : ইন্টারনেট

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক

এস এ মওদূদী

"

নবীজী (সা.) নিজে বকরি চরিয়েছেন, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কূপ থেকে বালতিতে পানি উঠিয়েছেন, ব্যবসা করেছেন, মাটি খনন করেছেন, রান্নার কাঠ সংগ্রহ করেছেন, রান্নায় সাহায্য করেছেন, টুপি সেলাই করেছেন, জামার উকুন বাছাই করেছেন, রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।

"

দুনিয়ায় কেউ শ্রম ক্রয় করে, আর কেউ শ্রম বিক্রি করে। যারা শ্রম বিক্রি করে তাদেরকে বলা হয় শ্রমিক। আর যারা শ্রম ক্রয় করে তাদেরকে বলা হয় মালিক। মালিক-শ্রমিকের এই ক্রয় বিক্রয়ের বাজারের দরকষা-কষিতে ভারসাম্য করে পৃথিবীতে খাদ্য, প্রযুক্তি, অবকাঠামো ও সভ্যতার ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে। পৃথিবী হচ্ছে সুন্দর, সুশোভিত ও উন্নত। কখনো কখনো শ্রমনীতি না জানা ও মানার কারণে ঘটে যায় অপ্রীতিকর ঘটনা। কেউ হয় অত্যাচারী ও অত্যাচারিত। মানুষের জন্য Standard Operating Procedure (SOP) হলো তাদের একমাত্র স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত গাইডলাইন (Manual Book) আল-কোরআন এবং জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। যে জীবনব্যবস্থা মানুষের সার্বিক জীবনের সমাধান দেয়, শ্রম ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের বিষয়ে বলে। ইসলামে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা প্রাথমিককাল থেকেই বলে আসছে। শ্রম দ্বারা যে মানুষ হালাল জীবিকা উপার্জন করে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত বলে ঘোষণা করেছেন।

কোরআন ও হাদিসের বাণী: আল্লাহ নিজে শ্রমিকদের প্রশংসা করে বলেছেন, "এমন বহু লোক আছে যারা জমিনের দিকে দিকে ভ্রমণ করে আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) খুঁজে বেড়ায়।" (সূরা মুযযাম্মিল : ২০)। সূরা জুমআয় নির্দেশনা রয়েছে, "সালাত আদায় হয়ে গেলে জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) খুঁজে বেড়াবে।" (৬২:১০)। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই খোঁজাখুঁজিকে সরাসরি জিহাদতুল্য ইবাদাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সাহাবীগণ লোকটির শক্তি, স্বাস্থ্য ও উদ্দীপনা দেখে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই লোকটি যদি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) থাকত! তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যদি লোকটি তার ছোট ছোট সন্তানদের জন্য উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে থাকে তাহলে সে আল্লাহর রাস্তাতেই (ফি সাবিলিল্লাহ) রয়েছে। যদি সে তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে থাকে তাহলে সে আল্লাহর রাস্তাতেই রয়েছে। যদি সে নিজেকে পরনির্ভরতা থেকে মুক্ত রাখতে উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে থাকে তাহলে সে আল্লাহর রাস্তাতেই রয়েছে।" (আত-তারগিব ২/৩৩৫; হাদিসটি সহীহ)। হাদিসে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে "হালাল উপার্জন মুসলিম মাত্রের উপর অবশ্য কর্তব্য।" (আত-তারগিব ২/৩৪৫; হাদিসটি হাসান)। অন্য হাদিসে আরও খুলে বলা হয়েছে "হালাল জীবিকা অন্বেষণ ফরয ইবাদাতের পরে একটি বাড়তি ফরয।" (বায়হাকি, সূত্র: মিশকাত/২৬৬১)। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর এই প্রক্রিয়াকে ইসলাম এত মূল্য দিয়েছে যে, বাহনে থাকা অবস্থায় পড়ে যাওয়া চাবুক উঠিয়ে আনতে অন্যের সাহায্য নেয়াকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ, সূত্র: মিশকাত/১৭৬৪)।

রাসূল ও তার পরিবারের শ্রম: নবীজী (সা.) নিজে বকরি চরিয়েছেন, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কূপ থেকে বালতিতে পানি উঠিয়েছেন, ব্যবসা করেছেন, মাটি খনন করেছেন, রান্নার কাঠ সংগ্রহ করেছেন, রান্নায় সাহায্য করেছেন, টুপি সেলাই করেছেন, জামার উকুন বাছাই করেছেন, রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। তাঁরই (সা.) মেয়ে হযরত ফাতিমা (রা.), যিনি জান্নাতি নারীদের নেত্রী হবেন, তিনি বাঁদী বা কাজের লোকের শরণাপন্ন না হয়ে ঘরের সকল কাজ নিজেই করতেন। নিজে ঘর ঝাড়ু দিতেন। নিজ হাতে জাঁতা ঘোরাতেন; এতে তাঁর হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিল। এমনিভাবে পানির মশক বহন করতে করতে তার বুকে দাগ বসে গিয়েছিল।

পূর্বের নবী ও রাসূলগণের শ্রম: পয়গাম্বর হযরত আদম (আ.) জমি চষে শস্য ফলাতেন, নূহ (আ.) ছিলেন কাঠমিস্ত্রি, ইদরিস (আ.) ছিলেন দর্জি। নবী দাউদ (আ.) ছিলেন কামার, যাকারিয়া (আ.) ছিলেন তাঁতী আর মূসা (আ.) ছাগলের রাখাল। সুতরাং কাজ যত ছোটই হোক, ইসলামের দৃষ্টিতে সম্মানজনক। অন্য দিকে, পরের কাছে থেকে চেয়ে পাওয়া জিনিস (ভিক্ষা) তা যত সুন্দর ভঙ্গিরই হোক, অবাঞ্ছিত, আত্মসম্মান বিরোধী। নবীজীর (সা.) ভাষায় "নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ খায়নি; আল্লাহর নবী দাউদ নিজের হাতে কাজ করে খেতেন।" (বুখারি, সূত্র: মিশকাত/২৬৩৯)। আর সৎ ব্যবসায়ীকে তো সুসংবাদ শোনানো হয়েছে এভাবে "সত্যবাদী, বিশ্বস্ত মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতে নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সঙ্গী হবে।"

(তিরমিযী, ৩/৫১৫; হাদিসটির সনদ হাসান)। অতএব, শ্রম ও পরিশ্রম-সাপেক্ষে স্বাবলম্বী হওয়ার বিকল্প নেই। এ জন্যই সাহাবীরা সবাই ছিলেন নিজের খাদেম বা স্ব-শ্রমিক। (বুখারী, ২/৭৮৯)

ভালো শ্রমিকের মৌলিক বৈশিষ্ট্য: আল-কুরআনের ভাষায় যোগ্য শ্রমিকের মৌলিক বৈশিষ্ট্য দু'টি -

এক: শক্তিশালী তথা সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য সামর্থ্যবান হওয়া।

দুই: আমানতদারি বা বিশ্বস্ততা। সামর্থ্যবান শ্রমিক যদি বিশ্বস্ত না হয়, তাহলে মালিকের পক্ষে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

উদাহরণ: তাইতো মূসা (আ.) যখন মিশর থেকে মাদায়েনে হিজরত করে ঘটনাক্রমে নবী শোয়াইব (আ.)-এর বাড়িতে আসলেন, তখন শোয়াইব (আ.)-এর এক মেয়ে তার বাবাকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, "হে পিতা! আপনি তাকে (মূসাকে আ.) মজুর নিযুক্ত করুন, কারণ আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে এমন ব্যক্তিই, যে (একই সাথে) শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত।" (২৮:২৬)।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর এক 'কর্মচারী-জিন'-এর জবানবন্দীতেও বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে। "সুলায়মান আরো বলল, হে আমার পরিষদবর্গ! তারা (রানি বিলকিস ও তার সাথীরা) আমার কাছে আসার আগে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবে? এক শক্তিশালী জিন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার আগেই আমি ঐ সিংহাসন নিয়ে আসব; আর এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান ও বিশ্বস্ত।" (সূরা নামল ২৭:৩৮, ৩৯)

ভালো মালিকের মৌলিক বৈশিষ্ট্য: আল-কুরআনের দৃষ্টিতে ভালো মালিকের মূল বৈশিষ্ট্য পাঁচটি- এক: সে বুঝে-শুনে সচেতনভাবে শ্রমিক নিয়োগ দেয়, দুই: পারিশ্রমিক আগেই নির্ধারণ করে নেয়, তিন: শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরি নির্ধারণ করে, চার: শ্রমিককে অযথা কষ্ট দেয় না এবং পাঁচ: শ্রমিকের সাথে সদাচরণ করে।

উদাহরণ: এই শিক্ষাই আমরা নিচের আয়াত ও তার দৃশ্যপট থেকে পাই "তাদের (শুয়াইব আ.-এর দুই মেয়ের) একজন বলল, পিতা! তুমি একে (মূসাকে আ.) মজুর নিযুক্ত কর, কারণ তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত। সে (শুয়াইব আ.) মূসাকে বলল, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাইলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।" (সূরা কাসাস ২৮:২৬, ২৮)

শ্রমিকের অধিকার: শ্রমিকের অধিকারকে আমরা মালিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব বলে ব্যক্ত করতে পারি। মালিক এই দায়িত্বপালন করে না বলেই পোশাক-শিল্পে অহরহ শ্রমিক-বিক্ষোভ ও হতাহতের ঘটনা ঘটে। ইসলাম মালিককে এ ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছে-

এক: নিয়োগের আগেই শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ করতে হবে, যাতে শ্রমিক না ঠকে এবং মালিককে ঝামেলার মুখোমুখি হতে না হয়। হাদিসের ভাষায় "মজুরের মজুরি নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিযুক্ত করবে না।" (বায়হাকি) আল-কুরআনে মজুরি নির্ধারণের এই আদর্শ দেখতে পাই, হযরত শোয়াইব (আ.) কর্তৃক হযরত মূসা (আ.)-কে পারিশ্রমিক নির্ধারণের মধ্যে। (সূরা কাসাস ২৮:২৭)

দুই: শ্রমিককে মানবিক জীবনযাপনের উপযোগী ন্যায্য মজুরি পারিশ্রমিক দিতে হবে। হাদিসে সাবধান করে বলা হয়েছে "নবী করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন রকমের লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করব, যাদের মধ্যে এক রকমের লোক হল তারা যারা শ্রমিকের কাছে থেকে পূর্ণ কাজ নিয়ে নিয়েছে অথচ তাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়নি।" (বুখারী ৪/২০৮৩; বায়হাকি, কিতাবুল ইজারা)

তিন: যথাসময়ে শ্রমিকের পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। নবীজীর (সা.) ভাষায় "ঘাম শুকানোর আগেই শ্রমিকের পাওনা মিটিয়ে দাও।" (ইবনে মাজাহ ২/৮১৭; হাদীসটি সহীহ)

চার: শ্রমিকের ওপর বাড়তি বা দুঃসাধ্য কাজ চাপাবে না। কঠিন কাজ দিলে তাকে সাহায্য করবে।

জীবনোপকরণ থেকে এমন কিছু দেয় না যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে?" (সূরা নাহল ১৬:৭১)

পাঁচ: শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখতে হবে; কারণ, সুস্বাস্থ্য ও বিশ্রাম নিশ্চিত করা না গেলে কাঙ্ক্ষিত শ্রম ও সার্ভিস পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। হাদীসে এসেছে "শ্রমিকদের প্রতি ঐ পরিমাণ কাজের দায়িত্ব চাপাবে, যা তারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে এবং তাদের শক্তি অনুসারে কাজ নিবে যাতে তাদের এরূপ কাজ করতে না হয়, যা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়।

ছয়: শ্রমিক ও অধীনস্থ যে কারোর ব্যাপারেই খুব বেশি হুঁশিয়ার থাকতে হবে। কারণ, অধীনস্থের সাথেই অসতর্ক আচরণ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। নবীজী (সা.) ইনতেকাল-সময়ের অসহ্য কষ্টের মধ্যেও দু'টি মাত্র জিনিসের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে গেছেন তার একটি সালাত, অন্যটি অধীনস্থ। নবীজীর (সা.) ভাষায় "সাবধান! সালাত এবং অধীনস্থের ব্যাপারে সাবধান!!" (ইবনে মাজাহ ১/৫১৯, ২/৯০০, ৯০১)

মালিকের অধিকার: শ্রমিকের যেটা করণীয় সেটাকেই বলা হয় মালিকের অধিকার। এই অধিকার আদায়ে শ্রমিকের করণীয় হচ্ছে-

এক: যে কাজ সহজে বা কিছুটা বাড়তি কষ্ট করে সম্পন্ন করা সম্ভব এমন কাজই নেবে; অসাধ্য সাধনের ঝুঁকি নিয়ে জীবন ও সুনামকে বিপন্ন করবে না। যে কাজ সম্পাদনের শক্তি-সামর্থ্য নেই, তাতে জড়িত হওয়ার মানে হয় না। (সূরা কাসাস ২৮:২৬)

দুই: স্বীয় কাজ বা দায়িত্বকে আমানাত (অবশ্য পরিশোধ্য অন্যের প্রাপ্য) মনে করে তা সম্যকভাবে আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহর তাগাদা রয়েছে "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানাত তার প্রাপকের কাছে পৌছে দিতে।" (সূরা নিসা ৪:৫৮)

তিন: শ্রমিককে অবশ্যই মালিকের কল্যাণকামী হতে হবে; নতুবা দায়িত্ব পালনে অবহেলা অবশ্যম্ভাবী। নবীজী (সা.) ইরশাদ করেছেন "উত্তম উপার্জন হলো শ্রমিকের উপার্জন যদি সে মালিকের কল্যাণ কামনার সাথে কাজ করে।"

উপসংহার: মালিক থাকলে শ্রম থাকবে। শ্রমিকের রিজিক হবে। আর শ্রমিক সন্তুষ্ট থাকলে মালিকের লক্ষ্য পূরণ হবে। তাই শ্রমিক মালিক ভাই ভাই হিসেবে কাজ করতে পারলে পৃথিবীর অর্থনীতি হবে ভারসাম্যপূর্ণ। যদি প্রভুত্ব আর দাসত্ব চলে আসে তাহলে উৎপাদন হবে বিশৃঙ্খলিত।

এমনও হতে পারে আজকে যিনি শ্রমিক কালকে তিনি মালিক। শ্রমিক থাকা কালে তিনি মালিকের কাছে থেকে যা পাবার আশা করতেন মালিক হওয়ার পর তা ভুলে যাওয়া যাবে না। ভাগ্যের লেখনীতে থাকার কারণে মালিককে কখনো যদি শ্রমিক হতে হয় তখন যেনো নিজে ততটুকুই আশা করেন যতটুকু তিনি শ্রমিককে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ সবাইকে কল্যাণকামী করুন। ব্যবসায় ও চাকরিতে বরকত দান করুন। আমিন।

লেখক : প্রকৌশলী, ইলেকট্রিক্যাল

সালমানরা সবাই ঢাকার মৌলভীবাজারে ৬ বছরের বসিরণকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সালমান খুবই অস্থির, হাতে এক ঘন্টাও সময় নাই। ১৯ নম্বর হাফিজুল্লাহ লেনেই থাকার কথা। কিন্তু বসিরণের পাত্তা নাই। ওদিকে পাকিস্তান সরকারের পূর্তসচিব (মন্ত্রী) আবদুস সালাম খান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এই শহিদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর ওদের হাতে হতে দেয়া যায়না। যে করেই হোক কোনো একজন ভাষা শহিদের আত্মীয়কে দিয়ে উদ্বোধন করানো দরকার। শহিদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগমকে এই মুহূর্তে পাওয়া সম্ভব না। শেষ ভরসা ভাষাশহিদ আবদুল আওয়ালের মেয়ে বসিরণ।

তমদ্দুন মজলিসের কর্মীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বসিরণ তখন পাশের ৪ ঘর পরে নসিমন বুড়ির ঘরে খিচুড়ি খাচ্ছে। "পইপই করিক নুংবাইরা গণ্ডগোল চলাচে, ইসকাধরি বের হবার নানাগে। অ্যালা চেংড়িটাক নিয়ামা ওটার কতো যন্ত্রণা। ৬ বছরি ছাওয়াটাক থুইয়া মরিল, উয়ার মাঅ্যালা কোনটে যায়, কোনটে না যায়।"

গত ৪ বছর ধরে বুড়ির এই এক কথা শুনে শুনে বসিরণের কান সহনীয় হয়ে গেছে, এতে করে ওর বাবার কথা মনে পড়লেও আগের মত অতটা কষ্ট লাগেনা। এই নসিমনই ওদের নিয়মিত খোঁজ রেখেছে। শাহবাগের বড় ফুলের দোকানটায় বসিরণকে কাজে দিয়েছে নসিমন বুড়ি, দোকানের মালিক বুড়ির দেশের বাড়ি নীলফামারী এলাকার পূর্ব-পরিচিত। দোকানে যাবার আগে বসিরণ আজ খিচুড়ি তাড়াতাড়ি সাবার করছে। নাহলে বুড়ির একই কথাগুলো শেষ হবেনা।

পিচ্ছি চম্পা দৌড়ে এসে জানালো, বসিরণ তোকে ৪-৫ জন ছেলে খুঁজতেছে। কেন খোঁজে? ততক্ষণে সালমানেরা বুড়ির দুয়ারে, ঘটনার ব্যাখ্যা না দিয়ে ওরা বসিরণকে নিয়ে চললো, অন্য কেউ হলে বুড়ি জেরা করতো, কিন্তু এই ছেলেগুলোকে বুড়ি চেনে, বসিরণও ততক্ষণে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে। এরা আওয়ালের জানাজার সময় ওবায়েদুল্লাহ নাকি জানি নাম সেই অফিসারের সাথে তর্ক করেছিলো। বিচার চেয়েছিল। পুলিশের ভিড়ে সেদিন বিচারের দাবি বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল। পুলিশে ঘেরা অফিসার বলেছিলো যে এটা নেহাত সড়ক দুর্ঘটনা।

সালমানের তাড়ায় রিকশা ততক্ষণে দ্রুত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দিকে যাচ্ছে। এতক্ষণে কি মন্ত্রীমশাই শহিদ মিনার উদ্বোধন করে ফেললেন? না, বিক্ষোভের মুখে মন্ত্রী মশাই গাড়িতে উঠে বসে আছেন, চারদিকে পুলিশ। প্রচণ্ড বিক্ষোভ আর ভিড় ঠেলে বসিরণরা সামনে এগোচ্ছে। সালমান ঘোষণা করলো এই সেই ভাষা শহিদ আবদুল আওয়ালের মেয়ে। সে-ই আজ শহিদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে। বসিরণ বুঝতে পারছেনা ভিত্তিপ্রস্তরটা কী জিনিস? হঠাৎই মায়ের কথা মনে পড়ে। সেই ফজরের নামাজের পরে প্রফেসর সাহেবের বাড়ি গেছে কাজ করতে। সন্ধ্যার পরে ফিরবে।

নাও বসিরণ, এখানে ইটটা বসাও। সম্বিত ফিরে পেয়ে ইটটা বসিয়ে দোকানের দিকে পা বাড়ায় বসিরণ। আজ অনেক দেরি হয়ে গেলো, আগামীকাল ২১ ফেব্রুয়ারি, আজ ও আগামীকাল অনেক ফুলবিক্রি হবে।

কিরে বসিরণ, এত দেরি কেন? উত্তরের অপেক্ষা না করেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো দোকানদার আলমাস মিঞা। তারপর আলমাস সাহেবের বন্ধুকে বসিরণের গল্প শোনানো শুরু করলো, ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখে মেডিক্যাল কলেজের সামনে গায়েবানা জানাজা ছিলো, ১৯৫২ সালে। ৪ বছর হয়ে গেলো। সরকার কি আর এসব সহ্য করবে? জানাজা শেষে শোক মিছিল। মিছিল যখন কার্জন হলের সামনে তখন মিলিটারি গাড়ি তুলি দিলো মুসল্লিদের ওপর। বসিরণের বাপ আওয়াল চাকার নিচে পড়ল।

পুলিশ তাড়াতাড়ি করে জানাজা করে মাটি দিয়া দিলো, কেউ শেষ দেখাটাও দেখবার পারলোনা। মরার সময় আওয়ালের বয়স ছিলো খালি ২৬। বেচারির মা ভার্সিটির এক প্রফেসরের বাড়িত কাম করে, প্রফেসরের নাকি নজর খারাপ! শ্রোতার দিকে খেয়াল নাই আলমাস মিঞার, ইতিহাস বলে চলেছে। আলমাস মিঞার কুষ্টিয়ার বন্ধু ইনুর চিন্তা তখন আরেক দিকে ঘুরছে।

ইনুর বয়স ৩৩, বসিরণের মায়ের বয়স এখনো ২৫ এর কোঠায়। আরো বছর দুয়েক কেটে গেছে, প্রতিদিন সন্ধ্যার মতো আজও বসিরণ মায়ের অপেক্ষায় আছে, এতো দেরি তো করেনা। বসিরণ পা বাড়ায় নসিমনের ঘরের দিকে।

প্রফেসর মাইনষে এতো বদ হয়? আল্লাহ-পরকালের ভয় নাই? বসিরণ ঘরে ঢোকার কারণে বুড়ির কথা হঠাৎ থেমে গেলো।

বসিরণের হাত ধরে মা ওকে টেনে ঘরে ফিরলো। মায়ের চোখে আজ কেমন জানি দুঃখ। বিষন্নতা বা হতাশার মতো শব্দগুলোর সাথে বসিরণের পরিচয় নেই। ওগুলোর গূঢ় অর্থও সে জানেনা। এদিকে ফুলের দোকানে বিক্রি দিনে দিনে বাড়ে, বসিরণের আয়ও বেড়েছে খানিকটা। সেদিনের পর থেকে মা আর প্রফেসরের বাড়িতে কাজে যায় নাই।

গত সন্ধ্যায় কুষ্টিয়ার ইনু এসেছিলো, ইনুদের বাড়িতে কাজ দিতে চায়। কিন্তু ইনুকে একদম সহ্য হয়না বসিরণের, মা, তুই ইনুর বাড়িতে যাইসনা, ওরে ভালালাগে না। ইনুর চোখের চাহনি মায়েরও ভালো লাগেনি। বসিরণ ইনুর বাড়িতে কাজ করতে যাবেনা, ফুলের দোকানের মালিক আলমাস মিঞার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে। ২ দিন পরে বসিরণের মা খুশি বেওয়া নিজ ঘরে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। বাড়িতে ইনু এসেছিলো, প্রফেসর কবিরের স্ত্রীর নাকি সোনার গহনা চুরি হয়েছে। ফেরত না দিলে খুশি বেওয়াকে পুলিশে দিবে। বাঁচার একটা পথ অবশ্য ইনু বলেছে, ইনু একটা ঘর ভাড়া নিবে বকশী বাজারে। সেখানে থাকতে বলেছে। দিনে ইনুর বাসায় কাজ করতে হবে।

নাহ, আর না! ইনুর কথার অর্থ খুশি বেওয়া বোঝে। রাতের বেলা বকশী বাজারের মা-মেয়ের ঘরটিতে যে কী ঘটতে যাচ্ছে তাভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। নসিমন বুড়ি ওদেরকে মিরপুরের বস্তিতে যেতে বললো, ততক্ষণে রাত ১১টা পার হয়েছে।

মা মেয়ের সম্বল ২টি ব্যাগ নিয়ে ওরা হাঁটছে। একটা রিকশা পেলে ভালো হয়, শাহবাগ পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে। মেডিক্যাল কলেজের রাস্তায় অনেক লোকের মিছিল। বড় ফুলের অর্ঘ্যের মাঝে লেখা "ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি"। প্রফেসর কবিরের নেতৃত্বে সেই মিছিলটি দেখে বসিরণরা আঁতকে ওঠে। গা লুকিয়ে নিজেদের রক্ষা করার জন্য ফুলার রোডের দিকে পা বাড়ায় মা ও মেয়ে।

ও হ্যাঁ, আজ তো ২১ শে ফেব্রুয়ারি...

asadbrur45@gmail.com

আত্মোপলব্ধির দর্শন

মুহাম্মদ আসাদ উল্লাহ আদিল

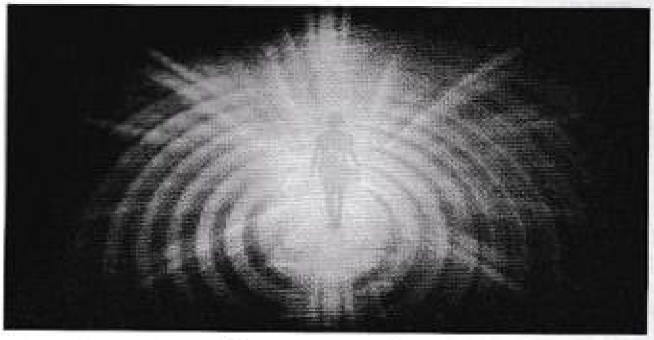

আত্ম, আত্মা, আত্ম পরিচয়, আত্মোপলব্ধি (Self Realization) শব্দগুলোর সাথে আমাদের পরিচয় আদিকাল থেকেই। মনু, মানুষ ও মনুষ্যত্বের সাথে শব্দগুলোর নিবিড় সম্পর্ক। জ্ঞান, জানা ও মানা আত্মা ও মনুষ্যত্বের ধারাবাহিক প্রকাশ। 'আত্ম, মনুষ্যত্ব, জানা ও মানা'আত্মোপলব্ধির Chronological process. মানব সভ্যতার প্রথম প্রতিযোগিতা জ্ঞানের। এটিই "আশরাফুল মাখলুকাত" স্বীকৃতির মূল ভিত্তি। রোমান সভ্যতা, পারস্য সভ্যতা, মেসোপটেমিয়া সভ্যতা ও মুসলিম সভ্যতার মূল নিয়ামক শক্তি ছিল জ্ঞানের চর্চা ও আবিষ্কার। বইয়ের কালো অক্ষর থেকে জ্ঞানের স্ফুরণ নাকি জ্ঞানীর মস্তিষ্ক নিঃসৃত চিন্তাধারা থেকে বোধের স্রোত ধারা প্রবহমান, সে প্রশ্নচিরন্তন। লেখ্য রীতি মানব সভ্যতার প্রাচীনতম উৎস হলেও চিন্তা, ধীশক্তি, বোধ ও উপলব্ধিই জ্ঞান রাজ্যের মূল চালিকা শক্তি। আদম (আ:)-এর সাথে ফেরেশতাকুলের মাঝে প্রতিযোগিতার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল জ্ঞান। কালক্রমে জাতির উত্থান-পতনের ভিত্তিও ছিল জ্ঞান, মান্যতা বা অবাধ্যতা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ (সা:)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি থেকে ইসলামী সভ্যতার (Islamic civilization) গোড়াপত্তনের আদি ভিত্তিও জ্ঞান নির্ভর। প্রথম ঐশীবাণী "পড়, তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুক্রাণু থেকে, পড়, তোমার মহামান্বিত রবের নামে যিনি মানুষকে কলম দিয়ে অজানা বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন।" (সূরা আলাক : ১-৫)। আল কুরআনের এ অংশে শিক্ষা ও শিক্ষা-উপকরণ, সৃষ্টি, স্রষ্টা, আত্মোপলব্ধি, আত্মমর্যাদা ও মনুষ্যত্বের স্বাতন্ত্র্য বিবৃত হয়েছে। কুরআনের পরতে পরতে জ্ঞানী, গবেষক, চিন্তাশীল ও চক্ষুষ্মানদেরকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাওহিদ ও রিসালাতের মূল প্রাণ জ্ঞান। হযরত মূসা (আ:) রিসালাতের দায়িত্ব পালনে জ্ঞানের প্রশস্ততার জন্য রবের কাছে ফরিয়াদ করেছেন। তিনি বলেন"হে আমার রব! তুমি আমার বক্ষকে জ্ঞানের জন্য উন্মুক্ত করে দাও।" (সূরা ত্বহা : ২৫)।

পশুত্বকে মনুষ্যত্বে রূপ দেয়া ও পাশবিকতার অতলতল থেকে মানবিকতার চরম শিখরে পৌঁছে দেয়াই গোটা কুরআনের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঐশী প্রত্যাদেশের প্রথম নির্দেশনা সংবলিত সূরা 'পড়' দিয়ে শুরু হলেও একই সূরা শেষ হয়েছে 'সিজদা কর ও (তোমার প্রভুর) নৈকট্য অর্জন কর' এ দৃষ্টি আকর্ষণী দিয়ে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে স্রষ্টাকে জানা ও মানা। আর স্রষ্টাকে জানার পূর্বে নিজেকে জানতে হবে। সক্রেটিসের ভাষায় 'KnowThyself' বা 'নিজকে জানো'। "যে নিজকে জানলো, সে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করতে পারলো। "সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল কুরআন শুরু হলেও সবচেয়ে বৃহত্তম সূরা আল বাকারা, যার অর্থ গাভী তথা পশু। আর সর্বশেষ সূরা হলো সূরা আন্-নাস, যার অর্থ মানুষ। এর গূঢ় রহস্য হলো, একজন মানুষের জীবন থেকে মূর্খতা, অজ্ঞতা ও পাশবিকতার গ্লানিকে ঐশী ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে দূর করে সত্যিকার অর্থে একজন জ্ঞান নির্ভর ও মানবিকতা বোধ সম্পন্ন মানুষে পরিণত করা। কোথায় ছিলাম? কোথায় যাব? কেনইবা আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে? কে সৃষ্টি করেছেন? এই ৩টি তথা who, why, where-ই আত্মপরিচয় ও আত্মোপলব্ধির মূল বিষয়বস্তু।

এ চারটি প্রশ্নের মাঝে গোটা মানব জাতি আজ ঘুরপাক খাচ্ছে। আজকের সবচেয়ে প্রতাপশালী, ক্ষমতাধর ব্যক্তিটি কখনো কি চিন্তা করেছে তার সৃষ্টি রহস্য নিয়ে? সে কি কখনো আত্মোপলব্ধিতে আনতে পেরেছে তার সৃষ্টির ক্রমবিকাশ? 'আমি জীবন কণাকে প্রথমে সুরক্ষিত স্থানে সংরক্ষণ করেছি', এর পর এটিকে জমাটবাঁধা রক্তে পরিণত করেছি, তার পর মাংস পিণ্ডে রূপ দিয়েছি, অতঃপর মাংসপিণ্ড থেকে হাড় তৈরি করেছি, চূড়ান্তভাবে আমি হাড়কে মাংস দ্বারাআবৃত করেছি।" (সূরা আল মু'মিনুন-১২-১৩) অনস্তিত্ব থেকে নিজের অস্তিত্বের দর্শনের মাঝেই আমরা স্রষ্টাকে খুঁজে পাই। একটি শহরের মোড়ে পৌঁছার জন্য যেমন অসংখ্য পথ ও গলি রয়েছে, তেমনি স্রষ্টাকে খুঁজতে ও একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করতে মানুষ বিভিন্ন পথ ও মত তৈরি করেছে। সে ক্ষেত্রে কুরআনিক দর্শন ব্যতীত বাকিগুলো পরিত্যাজ্য। অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য দৃশ্যমান সৃষ্টিজগৎ ও মানব অস্তিত্বই যথেষ্ট। মনন, বিবেক, বোধশক্তি ও জ্ঞান পিপাসার ইচ্ছার কারণে মানবজাতি অন্যান্য সৃষ্টি জীব থেকে ব্যতিক্রম।

জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধির সাথে সাথে পৃথিবীর সম্পদ রাজিকে মানব কল্যাণে ব্যবহার, সৃষ্টির উৎকর্ষ সাধন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্নয়নে মানবজাতিকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অনুভূতি শক্তি (Spiritual & Moral feelings power) প্রদান করা হয়েছে। সকল দেশের যেমন একটি রাজধানী বা কেন্দ্রবিন্দু থাকে, তেমনি রহস্যময় মানব শরীরের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আত্মা বা বিবেকবোধ। একই পরিবারের একই মা-বাবার দু-সন্তানের মাঝে অনেক কিছু মিল থাকলেও রুচিবোধ, চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান-বুদ্ধি, নীতি- নৈতিকতা, হিম্মত ও সাহসের মাঝে বিস্তর ফারাক পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য কেবল সংশ্লিষ্ট সত্তার সাথে সম্পর্কিত। ব্যক্তিসত্তা থেকে জাতিসত্তা ও ব্যক্তিদর্শন থেকে বিশ্বদর্শনের উৎপত্তি। 'আপন ভালো তো জগৎ ভালো', 'পৃথিবীকে গড়তে হলে সবার আগে নিজকে গড়ো' এ শ্লোগানগুলো একান্ত ব্যক্তিবোধের সাথে সংশ্লিষ্ট। মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীর মাঝে অশরীরী (Metaphysical) কোন কিছু নেই। কেবলমাত্র মানুষের মাঝে শারীরিক ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় রয়েছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সর্বোচ্চ ব্যবহার করে বিবেকবোধকে কাজে লাগিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্রষ্টার আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষতা সাধন করা সম্ভব। বর্তমান Paradoxical World এ মানব সভ্যতা নিছক বস্তুবাদী আধিপত্য, বর্ণ বৈষম্য, কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা দ্বারা আক্রান্ত। নিরেট আত্ম পরিচয়, আত্মোপলব্ধির কুরআনিক দর্শনের মাধ্যমে ক্ষয়িষ্ণু তথাকথিত উত্তর-আধুনিকতার মোড়কাবৃত প্রযুক্তি নির্ভর পুঁজিবাদী মানব সভ্যতাকে বাঁচানো সম্ভব। বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির নব নব আবিষ্কার আমাদের কুরআনিক ও আধ্যাত্মিক আবেগকে কেড়ে নেয়ার পাশাপাশি আমাদেরকে Global World এর ভৃত্যে পরিণত করেছে। আমরা অজানা গন্তব্য পানে নিরলস ভাবে ছুটে চলছি, কিন্তু চূড়ান্ত ঠিকানার শেষ মনজিল যেন খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সব কিছু পাওয়ার পরও কোনো কিছু আমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারছেনা। "যত পাই তত চাই" এ Theory তে আজ আমরা অস্থির। মূলত ইসলামের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে মানুষের প্রয়োজনীয়তা পূরণের আবহ, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও মানসিক শান্তির নির্মল পরিবেশ।

লেখক : অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল ইংলিশ স্কুল চিটাগাং
E-mail:auadilctg@gmail.com

মাঝি

মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে নানা রকম পেশায় নিয়োজিত হয়। কোনো কোনো সময় এ পেশাগুলো বংশ পরম্পরায় চলে। এ রকম একটা পেশা হচ্ছে খেয়া মাঝির পেশা। কোনো কোনো ঘাটে কয়েক পুরুষ ধরে কেউ কেউ এ কাজ করে থাকেন। আবহমান কাল থেকে 'মাঝি' বাংলার অন্যতম পেশা হিসেবে পরিচিত। মাঝিদের নিয়ে রচিত হয়েছে উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, সিনেমা; আর গানের কথা তো বলাই বাহুল্য। বাংলা লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারে বৃহৎ এক জায়গা করে আছে মাঝি মাল্লাদের জীবন সংগ্রামের কথা। সুতরাং, এই পেশা বাংলার সংস্কৃতির বিশেষ এক অনুষঙ্গও বটে। এক সময় চলাচলের মাধ্যম ছিল নৌকা। কৃষক তার নিত্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সারতে নৌকায় করে যাতায়াত করতেন। নদীবেষ্টিত গ্রামগঞ্জে বিবাহকাজে ব্যবহার হতো নৌকা। নৌকায় করে জামাই-মেয়ে নিয়ে আসাসহ বিবাহের কাজ সম্পন্ন করতে বরযাত্রী আসতো নৌকায় করে। নদী-নালার দেশ বাংলাদেশ।

এক সময় জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল নদী। নদীর বুকে চলত পাল তোলা বহর নাও বা নৌকা। এসব নায়ে মাঝির পেশায় নিয়োজিত ছিলেন অনেক লোক। এসব নায়ে দক্ষ মাঝিমাল্লার বেশ কদর ছিল। বহর নায়ের পাশাপাশি চলত টাবুরে নাও, পানশি নাও, ডিঙি নাও। এসব নায়ে চড়ে মানুষ পাড়ি জমাত দূরের পথে। প্রত্যন্ত এলাকায় এসব নাও ছিল একমাত্র যাতায়াতের মাধ্যম। নাওয়ের ছইয়ের ভেতর উঠে মানুষ শুয়ে-বসে কখনো ঘুমিয়ে সময় পার করত। মাঝিমাল্লা বেয়ে নিয়ে চলত উজান-ভাটির পথ। হাতে বৈঠা চলত বিরামহীন। মুখে গাইত তারা সারি, ধুয়া, ভাটিয়ালিসহ নানা রকমের গান। মাঝিরা চলতি পথে নাও চালানোর কষ্ট ভুলতে এসব গান মুখে মুখে গেয়ে যেত। কিন্তু নদী ভরাটের ফলে ইদানীং মাঝির মুখ থেকেও হারিয়ে যাচ্ছে এসব গান। এক কালের জনপ্রিয় গান নদীর 'কূল নাই কিনার নাই রে।' আজ শুধুই এসব অতীতের সাক্ষী হয়ে জেগে আছে মানুষের মনে। কূল-কিনারাহীন অনেক নদী শুকিয়ে খালের আকৃতি নিচ্ছে। কমছে নদীপথ ও খেয়াঘাটের সংখ্যা। আজকাল যাতায়াত ব্যবস্থায় উন্নয়নের ফলে অনেক ঘাটে ব্রিজ নির্মিত হয়েছে। এ কারণেও খেয়া পারাপারের যাত্রীর সংখ্যা আগের তুলনায় কমে গেছে। কারণ যাত্রীরা ও যানবাহন এখন ব্রিজের ওপর দিয়ে সহজে পার হচ্ছে। উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে এখন অধিক সময় ব্যয় করে কেউ নদীপথে চলাচল করতে চায় না। বৈঠা, দাঁড়ের নৌকার পরিবর্তে এখন অনেকে অবশ্য কিনে নিয়েছে ইঞ্জিনচালিত নৌকা, ট্রলার ইত্যাদি। কিন্তু নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণে এগুলোও বন্ধের উপক্রম হয়েছে। মাঝি পেশাগতভাবে দেশীয় নৌযান চালনা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। মাঝিরা নৌকা চালান খাল, বিল, নদী, নালা, ঝিলে।

পেশা পরিচিতি

হাওর-বাঁওড়ে অসংখ্য নদী-নালাবেষ্টিত বাংলাদেশে নদীপথে নৌকাই অনেক ক্ষেত্রে যোগাযোগের অন্যতম বাহন। নৌকা বেয়ে চলা যাদের পেশা তারা অঞ্চলভেদে এক এক নামে পরিচিত, যেমন মাল্লা, নাওয়া,

নৌকাজীবী, নৌকাচালক, কাণ্ডারি, পাটনি, কর্ণক ইত্যাদি। তাদের কাজের ধরন, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন। যাত্রী বহন করা এবং মালামাল পরিবহনের জন্য বিভিন্ন ধরনের নৌকা আছে। যাত্রীবাহী নৌকা ছোটও হয়, আবার বড় আকারেরও হয়। ছোট আকারের নৌকায় সাধারণত একজন মাঝি থাকে। বড় আকারের নৌকায় দুইজন মাঝি থাকে। মালবাহী নৌকা সাধারণত বড় করা হয় এবং বাধ্যতামূলকভাবে দুইজন বা আরও বেশি মাঝি থাকে। আগেকার দিনে ধনী পরিবারগুলির আনন্দবিহারে যাওয়ার প্রমোদতরীর জন্য স্থায়ীভাবে একজন করে মাঝি থাকত। কয়েক বছর দেশের বিভিন্ন নদীর সুবিশাল বুকজুড়ে ছিল নৌকা-সাম্পানের অবাধ বিচরণ। স্থানে স্থানে নদীর থৈ থৈ রূপালি পানির ধারে ছিলো খেয়া পারাপারের মুখরতা। ঘাটে ঘাটে সারাক্ষণ ছিল বৈঠা-পানির শব্দ। কিন্তু সেই দৃশ্য এখন আর তেমন চোখে পড়ে না। যান্ত্রিক সভ্যতার দাপটে হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী নৌকা-সাম্পানগুলো, ফুরিয়ে যাচ্ছে মাঝিদের সোনালি দিন। একসময় নদী পাড়ের মানুষের সাথে নৌকা-সাম্পানের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ।

নদী তীরের বাসিন্দাদের জীবনের জন্য ছিল নৌকার নিবিড় প্রয়োজন। বাজার-হাটে যাতায়াত থেকে শুরু করে বিয়ের অনুষ্ঠানেরও একমাত্র বাহন ছিল পালতোলা নৌকা। উন্নত সড়কপথ না থাকায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতেও নৌকা ছিল একমাত্র ভরসা। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় এসে সড়ক যোগাযোগের উন্নতি হওয়ায় ইঞ্জিন-চালিত যানবাহনের দখলে চলে যাচ্ছে সবকিছুই। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে এক সময়ের ঐতিহ্য নানা নামের বাহারি নৌকা। নদী থেকে নৌকার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন এসব নৌকা-সাম্পানের সাথে জড়িত মাঝি পরিবারের সদস্যরা। খেয়া ঘাটের মাঝিরা বাধ্য হয়ে এখন তাদের আদি পেশা পাল্টিয়ে ফেলছেন। মাছধরা, গাছ-বাঁশ কাটা, ধান কাটাসহ দিনমজুর হিসেবে বিভিন্ন বিকল্প পেশায় চলে যাচ্ছেন তারা। অন্য দিকে নদীর নাব্যতা হারানোর ফলে এবং কিছু কিছু ঘাটে ইঞ্জিনচালিত বড় নৌকার মাধ্যমে যাত্রী ও মালামাল পারাপার হওয়ার কারণে সাম্পান নৌকার কদর কমে গেছে। অনেক স্থানে ব্রিজ হওয়ায় এখন আর তেমন নৌকার ভাড়া নেই। আয় উপার্জন আগের মতো আর হয় না। অন্য দিকে বেশির ভাগ মাঝি মহাজনদের কাছ থেকে নৌকা ভাড়া নিয়ে নদীতে চালাতে হয়। মালিকরা নৌকা ভাড়া আগের তুলনায় অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া এখন ঘাট মালিকদের টোল প্রদান ও মালিকের নৌকা ভাড়া প্রতিদিন পরিশোধ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। রুটি রুজির তাগিদে মাঝিরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-তুফান উপেক্ষা করে নৌকা চালিয়ে যা উপার্জন করে তার বেশির ভাগই নৌকা মালিক ও ঘাট মালিকদের পাওনা বাবদ পরিশোধ করতে হয়। এতে অবশিষ্ট আয়ের অংশ দিয়ে সংসার চালানো কষ্টসাধ্য। মাঝিদের অনেকেই এ পেশায় ২৫-৩০ বছর যাবৎ জড়িয়ে রয়েছেন। তাদের উপায় নেই জেনেও অনেকে এই পেশা ছাড়তে পারছেন না। আবার জীবিকার তাগিদে অনেকে অন্য পেশায় যেতে বাধ্য হচ্ছেন। মাঝিদের মধ্যে অনেক পরিবার ভূমিহীন। তা ছাড়া এদের কোন ঋণেরও ব্যবস্থা নেই। ফলে তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে এখন মানবেতর জীবনযাপন করছেন। মানুষকে এখন আর মাইলের পর মাইল পালতোলা নৌকায় পার হতে হয় না। হয় না বইঠায় ঢেউভাঙা নৌকায় চড়েও। সড়ক যোগাযোগের বিস্তার ঘটেছে। আবার যেটুকু নৌপথ রয়েছে, সেখানেও আছে ইঞ্জিনের জলযান। এ কারণে কমেছে মাঝিদের কদর। তবে হাল আমলে কোথাও কোথাও দিব্যি টিকে আছে এই দাঁড়টানা নৌকা। আছেন মাঝি। এর বেশির ভাগই ব্যবহার হয়ে থাকে ছোট্ট পরিসরে খেয়া পারাপারে। যেমনটি দেখা যায় রাজধানী ঢাকার বুড়িগঙ্গায়। রাজধানীকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখা এই নদীতে প্রায় অর্ধশত খেয়াঘাট রয়েছে। এই খেয়া পারাপারের সঙ্গে জড়িত প্রায় পাঁচ হাজার মাঝি। পারাপারের মাধ্যমে অর্জিত অর্থই এসব পরিবারের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস। যদিও নৌকা চালানো মাঝিদের মূল কাজ তথাপি নিকটবর্তী নদীনালা থেকে মাছ ধরার কাজেও তারা অনীহ নয়। বরং মাছ ধরা তাদের জীবিকা নির্বাহের দ্বিতীয় পন্থা। মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত নৌকাগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত, যথা জেলেডিঙ্গি, ডিঙ্গি, পানশি, গয়না, ঘাসি ইত্যাদি। সাধারণত এই নৌকাগুলি হয় দাঁড়বিশিষ্ট। মাঝি দাঁড় বেয়ে চলে অথবা অন্য কেউ দাঁড় বা বৈঠা ধরলে মাঝি নিজেই তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়। অনুকূল বাতাসের সুবিধা নেয়ার জন্য নৌকাগুলিতে প্রায়শ পাল তোলা হয়। আর মাঝে মধ্যে সুবিধার্থে গুন টানা হয়। বড় বড় নৌকাগুলিতে থাকে মাস্তুল আর নোঙর। ছোট ছোট নৌকাগুলি স্থির হয়ে থাকার জন্য খুঁটা গেঁড়ে নদীর ধারে নোঙর করে।

আজকাল দূরবর্তী যাত্রার জন্যে স্টিমার এবং বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের নৌকাই যাত্রীবাহী নৌকা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দ্রুতগতিতে অধিক যাত্রী বহন করার জন্য মোটরইঞ্জিন চালিত নৌকাও ব্যবহৃত হয়। দাঁড়টানা মাঝিরা আজকাল নিজেদের পরিবর্তন করেছে ইঞ্জিনের নৌকার মাঝিরূপে। আবার অনেক মাঝিই মাঝিগিরি ছেড়ে নিজেকে কৃষিকাজ, মাছধরা ও ডুবুরির কাজে নিয়োজিত করছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে মানুষের জীবনে নদীর প্রভাব অনস্বীকার্য। বহুভাবে রয়েছে নদীর ওপর নির্ভরশীলতা। বিশেষ করে মাঝি ও জেলেদের জীবন জীবিকা ওতপ্রোতভাবে নদীর সঙ্গে জড়িত। নদী ভরাটের ফলে যেমন দেশের পরিবেশের ক্ষতি তেমন মাঝিদের জীবিকাও বিপন্ন হবে। শুধু কি তাই! বিপন্ন হবে পরিবেশ। পরিবেশ বিপন্ন হলে সর্বাগ্রে বিপন্ন হবে দেশ, জাতি ও রাষ্ট্র।

সংগ্রহে : বিলস

আবহাওয়ার গত কয়েক বছরে যে পরিবর্তন এসেছে তা বেশ অস্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক জনজীবনে বেশ প্রভাব ফেলছে। আর প্রতি বছর সারাদেশে তাপমাত্রার যে বিপর্যয়, তাতে অবস্থা বেশ অসহনীয় ও ভয়ানক পর্যায় বিরাজ করে। অতিরিক্ত গরমের পিছনে বিশেষ কারণ হচ্ছে, বছরের ঠিক দুই সময় পৃথিবী বিষুব রেখায় সূর্য বরাবর অবস্থান করে। এতে সূর্য রশ্মি সরাসরি পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে পড়ে। ফলে বেশি গরম অনুভূত হয়। এই সময় দিন রাত সমান থাকে।

গরম আবহাওয়া সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ যাদের জন্য– ৬০ বছরের বেশি বয়স্ক মানুষ, ১০ বছরের নিচে শিশু, দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসযন্ত্র বাডায়াবেটিসের রোগী, যারা সরাসরি সূর্যের নিচে বা গরম এবং কম বাতাসযুক্ত এলাকায় শ্রমের কাজ করেন– এই গরমে সরাসরি সূর্যের নিচে কাজ করা ঝুঁকিপূর্ণ। তাপ সংক্রান্ত অসুস্থতা ফুসকুড়ি ঘামের কারণে হয়ে থাকে এবং বিশেষ করে ছোট শিশুদের মাঝে বেশি দেখা যায়। সাধারণত যারা ঘনবসতি পূর্ণ এবং স্যাঁতস্যাঁতে এলাকায় বসবাস করেন, গরমে তাদের উচিত ঘরে বাতাস চলালের ব্যবস্থা করা।

শরীরে পানির পরিমাণ অন্যান্য তরলপদার্থ থেকে কমে গেলে ডিহাইড্রেশন হয়। গরমে প্রায় সকলেরই কম বেশি ডিহাইড্রেশন হয়। ডিহাইড্রেশনের ফলে শরীর ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেনা এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে যে কেউ দুর্বল বোধ করেন। তাৎক্ষণিক ভাবে চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং শরীর দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

শরীর থেকে অধিক পরিমাণে পানির সাথে লবণ বের হয়ে যাওয়ার কারণে হাত ও পায়ের পেশি ক্র্যাম্পকরে। হিট ক্র্যাম্প হচ্ছে হিট এক্সনের প্রথম ধাপ। হিট এক্সন হচ্ছে অতিরিক্ত গরমে থেকে সৃষ্ট আরেক ধরনের অসুস্থতা। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে হিট এক্সনের কারণে অনেক সময় হঠাৎ করে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়।

যখন শরীরের তাপমাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়না এবং তাপমাত্রা ৪০.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌছে যায়, তখন যে কেউ হিট স্ট্রোক করতে পারেন। তাপ সম্পর্কিত এটি সবচেয়ে গুরুতর অসুস্থতা এবং এটি জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ। হিট স্ট্রোকের লক্ষণগুলো হলো- ১০৪ ডিগ্রি ফারেন হাইট বা এর চেয়ে বেশি জ্বর, চামড়া লাল হয়ে যাওয়া, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হওয়া, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া। তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে শরীরের তাপমাত্রা যত দ্রুত সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। অর্থাৎ রোগীকে ঠাণ্ডা কোন জায়গায় রেখে শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক করতে হবে। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে অবশ্যই মিষ্টি বা স্যালাইন দিতে হবে। এতে দ্রুত সুগার লেভেল বেড়ে যাবে। তীব্র গরমে যা করবেন–

ঠান্ডা পরিবেশে থাকুন: ঘরে যথাসম্ভব ঠাণ্ডা পরিবেশে অবস্থান করুন। অপ্রয়োজনীয় কারণে দিনে, বিশেষ করে দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৩টা বাইরে বের না হওয়া ভালো। বের হলে অবশ্যই ছাতা সাথে নিবেন। গরমে কালো রঙের ছাতা পরিহার করুন। সারা দিনে প্রচুর পানি পান করুন। বাইরে বের হওয়ার সময় পানি সাথে নিন। দিনে কমপক্ষে ৩ লিটার পানি পান করুন। আরামদায়ক পোশাক পরিধান করুন। বাচ্চাদের জন্য সুতির হালকা রঙের কাপড় নির্বাচন করুন। খুব গরমে কালো রঙ পরিহার করুন। প্রচুর পরিমাণে মৌসুমি ফলও ফলের জুস খান। গরমের সময় টক ফল খুবই ভালো। কিন্তু যাদেও নিম্ন রক্তচাপ, গরমের সময় তারা অতিরিক্ত টক খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় সবুজ সালাদ বা সবজি রাখুন। এতে শরীরে পানি ও খনিজের ঘাটতি হবেনা এবং শরীর ঠাণ্ডা থাকবে। গরমে বাইরে বের হওয়ার সময় ছাতা নিতে ভুলবেন না।

প্রচুর পানি পান করুন: সারাদিনে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করুন। বাইরে বের হওয়ার সময় পানি সাথে নিন। দিনে কমপক্ষে তিন লিটার পানি পান করুন। তবে বাহির থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আগে পানি পান করবেন না আগে নিজেকে জিরিয়ে নিন।

আরামদায়ক পোশাক পরিধান করুন: গরমে আরামদায়ক পোশাক পরিধান করুন। বাচ্চাদের জন্য সুতির হালকা রঙের কাপড় নির্বাচন করুন। খুব গরমে কালো রঙ পরিহার করুন। বাচ্চাদের রাতে বেশি মোটা কাপড় পরিধান করাবেন না কারণ এতে শরীর ঘেমে যেতে পারে এবং সেই ঘাম শরীরে বসে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

মৌসুমি ফল গ্রহণ করুন: প্রচুর পরিমাণে ফল ও ফলের জুস খান। গরমের সময় টক ফল খুবই ভালো। কিন্তু যাদের নিম্ন রক্তচাপ, গরমের সময় তারা অতিরিক্ত টক খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

সবুজ সালাদ বা সবজি খান: প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় সবুজ সালাদ বা সবজি রাখুন। এতে শরীরে পানি ও খনিজের ঘাটতি হবেনা এবং শরীর ঠাণ্ডা থাকবে। খাবারের তালিকায় রাখুন সবুজ সবজি ও সালাদ।

অতিরিক্ত গরমে বর্জনীয়- গরমে করণীয় যেমন আছে তেমনি আছে কিছু বর্জনীয় বিষয়। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো–

সফট অথবা হার্ড ড্রিঙ্কস নেয়া থেকে বিরত থাকুন: অতিরিক্ত গরমে সফট অথবা হার্ড ড্রিঙ্কস নেয়া থেকে বিরত থাকুন। ড্রিঙ্কস শরীরের পানিকে নিষ্কাশিত করে যা শরীরে পানি স্বল্পতা তৈরি করে। এছাড়াও ঘন ঘন পানি পিপাসাপায় এবং গলা শুকিয়ে আসে। তাই গরমে সাময়িক তৃষ্ণা মেটাতে অবশ্যই ড্রিঙ্কস না। গরমের কারণে যেকোনো জায়গা থেকে পানি পানে বিরত থাকুন। দূষিত পানি থেকে পানি বাহিত রোগ হতে পারে। এ জন্য পানি পান করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। বাইরের পানি পান করার ক্ষেত্রে অবশ্যই মিনারেল ওয়াটার গ্রহণ করুন। ফাস্টফুড এবং তেলচর্বি জাতীয় খাবারকে না বলুন। ফাস্টফুড এবং তেলচর্বি জাতীয় খাবার শরীরের জন্য খারাপ। গরমে তেলে ভাজা বা রিচ ফুড খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

পানি পানের সময় সতর্ক থাকুন: গরমের কারণে যে কোনো জায়গা থেকে পানি পান থেকে বিরত থাকুন। দূষিত পানি থেকে পানি বাহিত রোগ হতে পারে। এ জন্য পানি পান করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। বাইরের পানি পান করার ক্ষেত্রে অবশ্যই মিনারেল ওয়াটার গ্রহণ করুন।

ফাস্ট ফুডকে না বলুন: ফাস্টফুড এবং তেলচর্বি জাতীয় খাবারকে না বলুন। ফাস্টফুড এবং তেলচর্বি জাতীয় খাবার শরীরের জন্য খারাপ। গরমে তেলে ভাজা বা রিচ ফুড খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। গরমে এ জাতীয় খাবার যত বেশি খাবেন, তত বেশি গরম লাগবে। সুতরাং এ ধরনের খাবার না খাওয়াই ভালো। স্ট্রিট ফুড বর্জন করুন অতিরিক্ত গরমে।

স্যালাইন খাওয়ার সময় সতর্ক থাকুন: গরমের কারণে ঘরে থাকতে চাইলেও অনেকেই আছেন শারীরিক পরিশ্রম করেন। তাদেরকে কাজের জন্য বাইরে যেতেই হয়। অনেকেই আছেন দিন আনেন দিন খান। সে ক্ষেত্রে যেন শরীরে পানি বা লবণের স্বল্পতা না হয় এই জন্য স্যালাইন খেতে পারেন। বাইরে চলাচলের সময় কাছে স্যালাইন রাখতে পারেন। যদি শরীর দুর্বল মনে হয়, সে ক্ষেত্রে সাথে সাথে স্যালাইন খেয়ে নিতে পারেন। এতে দুর্বলতা কমবে। প্যাকেটের গায়ে নির্দেশিত পরিমাণ পানির চেয়ে কম পানি দিয়ে স্যালাইন খাবেন না। শুধু স্যালাইন গুঁড়া খেলে বা কম পানি দিয়ে স্যালাইন খেলে লবণের ঘনত্ব বেড়ে কিডনির ক্ষতি হতে পারে। এই গরমে নিজের পাশাপাশি পরিবারের যত্ন নিন। বাইরে চলাফেলার সময় বয়স্ক এবং শিশুদের দিকে খেয়াল রাখুন এবং তাদেরকে অগ্রাধিকার দিন যানবাহনে চলাচলের ক্ষেত্রে। কেউ অসুস্থ হলে সচেতনতার সাথে সিদ্ধান্ত নিন। সচেতন থাকুন, সুস্থ থাকুন।

সংগ্রহে : ইন্টারনেট

আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো ও নির্মাতাদের কাছে আমরা কী চাই?

মমিন উল্লাহ পাটওয়ারী

আমাদের টিভি চ্যানেলগুলোর ভূমিকা দেখে সত্যিই আমরা অবাক হই। তারা সব সময় ভারতীয় চ্যানেলগুলো অনুসরণ করার জন্য চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু তাদের এই বুঝটি কেন এখনও তৈরি হয়নি, ভারতীয় চ্যানেলগুলো তাদের ধর্মীয় অনুশাসনকে সামনে রেখেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ করেন। তারা হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখেই তাদের নাটক-সিনেমাগুলো তৈরি করে থাকেন। একইভাবে তাদের ছড়া, কবিতা, গান ও গল্প– সকল কিছুতেই হিন্দুধর্মের একটা বড় ধরনের প্রভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে থাকেন। হিন্দুধর্মের শাঁখা-সিঁদুর ধুতি ইত্যাদি পরিধান করেই নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকারা তাদের অভিনয়গুলো উপহার দিয়ে থাকেন। বেশির ভাগ পজিটিভ চরিত্রগুলো থাকে হিন্দুধর্মের মূল পোশাকে এবং তারা নেগেটিভ চরিত্রগুলোকে মুসলিম কৃষ্টি কালচারের সাথে মিলিয়ে সংস্কৃতির সাথে মিলিয়ে দিতে দেখা যায় এবং সেগুলো তাদের দেশে অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু কী আশ্চর্যের বিষয় বাংলাদেশী লেখক গবেষক কলামিস্ট শিক্ষক শিল্পী-সাহিত্যিক বেশির ভাগই যেন ইসলাম ধর্মকে খোঁচা দিতে পারলে তাদের কাছে ভালো লাগে।

আমাদের নাটক-সিনেমাগুলো সত্যিই আমাদের অবাক করে তোলে। তারা ইসলামের পোশাক ইসলামের তাহজিব তমদ্দুন, সেগুলোর উপর হামলা করতে পারলেই মনটা শান্তি পায়, তাদের আচরণ এবং তাদের উপস্থাপনায় সেগুলোই প্রকাশ করে। নেগেটিভ চরিত্রগুলোতে দাড়িওয়ালা কোনো হুজুরকে অথবা টুপিওয়ালা কোনো লোককে উপস্থাপন করে তারা মনে শান্তি পায়। পজিটিভ চরিত্রগুলোতে তারা ক্লিন শেভ শার্ট কোট-প্যান্ট-টাই পরিয়ে তাদেরকে উপস্থাপন করে। আমাদের যুবসমাজ কিশোর-তরুণ সাধারণ ছাত্ররা সেগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ছে এবং সেগুলো অনুসরণ করার চেষ্টা করে, যা একটা পর্যায়ে এসে আমাদের একটা বৃহৎ জনশক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ইসলামী তাহজিব তমদ্দুনের বিরুদ্ধে তৈরি করে। কিন্তু কেন যারা যুগ যুগ ধরে ইসলামের কথা বলে আসছেন ইসলামের ধ্বজাধারী ইসলামকে লালন-পালন করার কথা বলেন নিজেরা মুসলিম দাবি করেন তাদের এরকম হওয়া আমরা কি আশা করি। নিশ্চয়ই উত্তর হবে না।

আমরা বলতে চাই ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে আমাদের মুসলিম লেখক-গবেষক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও টেলিভিশন নাটক-ছবি নির্মাতা– সবাইকে এগিয়ে আসা উচিত। এমন একটা নাটক তৈরি হবে এমন একটা সিনেমা তৈরি হবে যেটা দেখার পরে মানুষ ইসলামের প্রতি ঝুঁকে আসবে সেই ধরনের অমিয় শক্তি ইসলামের ভিতরে আছে। একটা সিনেমা দেখার পরে যেন একজন মানুষ নামাজি হয়ে যায়, একজন মানুষ দ্বীনদার হয়, ঈমান বুঝে আল্লাহকে চিনে রাসূলকে চিনে। সাহাবা আজমাইনের জীবনী, মুসলিম খলিফাদের জীবনী, মুসলিম স্কলারদের জীবনী– ইসলামের এমন কোনো বিষয় যেটি উপস্থাপনা করলে মানুষের হৃদয়গ্রাহীভাবে ফোন করে নেবে, মানুষকে নাড়া দেবে সেটি উপস্থাপন করুন। আমাদের দেশে অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লেখক-গবেষক রয়েছেন, নাট্যকার ছবি-নির্মাতা রয়েছেন। তারা চেষ্টা করলে অনেক জনপ্রিয় এবং হৃদয়গ্রাহী সিনেমা নাটক তৈরি করা সম্ভব হবে।

তাই আসুন যে সকল নির্মাতা এগুলো নির্মাণ করছেন তারা দুই দিকের কথা চিন্তা করবেন দুনিয়া এবং আখেরাত। আপনাকেই চূড়ান্ত করতে হবে আপনি কী চান। দর্শক জনপ্রিয়তার কথা চিন্তা করবেন না, আপনি সে রকম ছবি নির্মাণ করে দেখুন হাজার হাজার কোটি কোটি লোক সেগুলোর পিছনে হন্যে হয়ে ছুটবে। আমরা চাই মূলত এমন একটা সিনেমা এমন একটা নাটক যা দেখার পরে একজন মানুষ তার ভেতরে তাহাজ্জুত নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিবেন। নফল সিয়াম পালনের প্রস্তুতি নেবেন, নিজেকে একজন খোদাভীরু মানুষ হিসেবে তৈরি করার প্রস্তুতি নেবেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকে নিজের জীবনের ব্রত হিসেবে নিবেন। তাওহিদ, রেসালাত, আখেরাত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা তৈরি হবে। জাতীয় চরিত্রের দুর্নীতি, কদাকার, হিংসা ও বিদ্বেষ দূর হয়ে ভ্রাতৃত্ব ভালোবাসার সম্পর্ক, পরস্পর আস্থা-বিশ্বাস, দুর্নীতিমুক্ত একটা সুশীলসমাজ এবং জাতীয় স্বার্থে সবার ঐক্যবদ্ধ সমাজ তৈরি হবে।

লেখক : সভাপতি, লক্ষ্মীপুর জেলা, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

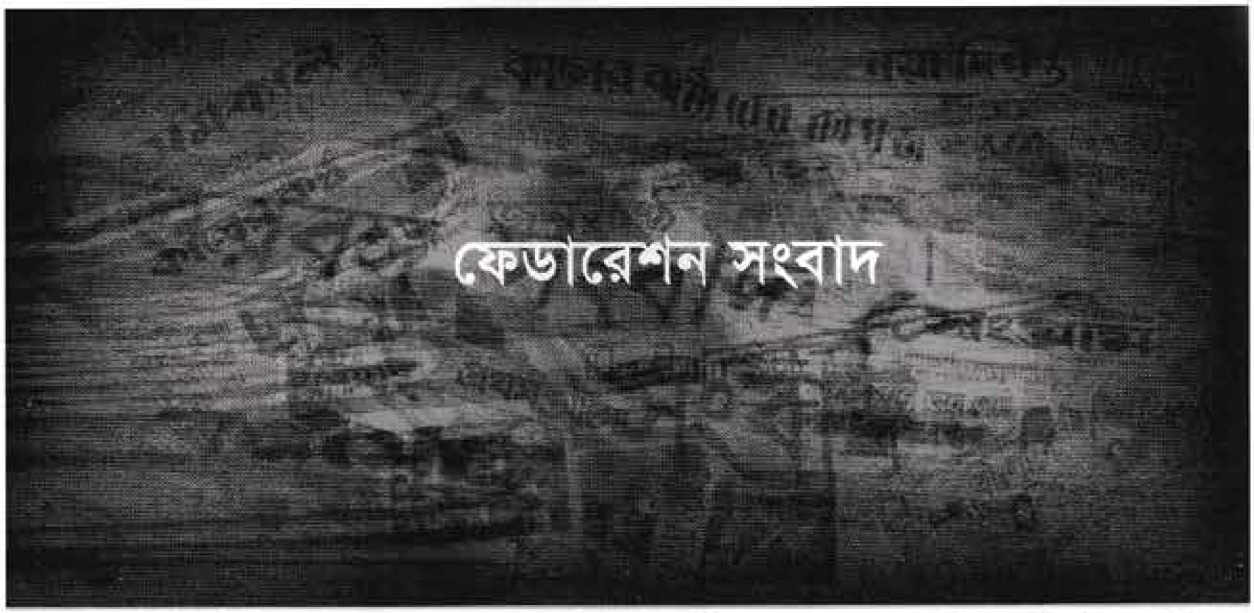

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত

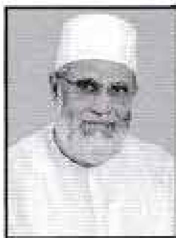

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ অধিবেশনে আ.ন.ম শামসুল ইসলাম ফেডারেশনের নতুন সভাপতি নির্বাচিত

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের বিশেষ অধিবেশন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় রাজধানীর এক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। গত ১ জানুয়ারি ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার অব্যাহতি নেওয়ায় উক্ত অধিবেশনে সাবেক এমপি আ.ন.ম শামসুল ইসলামকে ২০১৯-২০২০ সেশনের বাকী সময়ের জন্য ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। অধিবেশনে সোহেল রানা মিঠু ও জামিল মাহমুদ ফেডারেশনের কার্যকরী পরিষদের নতুন সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্বপালন করেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। নব-নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি কার্যকরী পরিষদের সাথে পরামর্শ করে ফেডারেশনের প্রচার সম্পাদক আজহারুল ইসলাম, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক নুরুল আমিন এবং ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মহিবুল্লাহকে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য মনোনিত করেন।

চট্টগ্রাম মহানগরীর সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

পথহারা শ্রমিক সমাজের মুক্তি ও মর্যাদা রক্ষার শ্রমিক আন্দোলনের কাজ আরো জোরদার করতে হবে- আ.ন.ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আ.ন.ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের জনসংখ্যার বেশির ভাগই শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ইসলামী শ্রমনীতি সম্পর্কে কোনো ধারণা তাদের নেই। এমনকি রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ভাবেও শ্রমজীবি মানুষকে ইসলামী শ্রমনীতির সুফল সম্পর্কে জানাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। বরং স্যাকুলার, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদীরা শ্রমিক সমাজকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে। তাই পথহারা শ্রমিক সমাজের প্রকৃত মুক্তি ও মর্যাদার জন্য ইসলামী শ্রমনীতির সঠিক ধারণা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রামকে জোরদার করা। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরী আয়োজিত সদস্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে আরো বলেন, এ দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষকে ইসলামের আলোতে আলোকিত করার সু-মহান দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন। তিনি বলেন, প্রিয় মাতৃভূমিকে সোনার বাংলায় রূপান্তর করতে হলে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের বিকল্প নেই। অতএব কোটি কোটি শ্রমিক জনতাকে সাথে নিয়ে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সময়ের দাবী। ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এস.এম. লুৎফর রহমানের পরিচালনায় উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর সহ-সভাপতি কাজী জাহাঙ্গীর হোসাইন, এনামুল কবির, মকবুল আহমদ ভুঁইয়া, আবু তালেব চৌধুরী, মুহাম্মদ নুরুন্নবী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ঢাকা মহানগরী উত্তরের সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি মহিবুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয়

ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, মহানগরী উপদেষ্টা আঃ রহমান মুসা, জামাল উদ্দিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা অসুস্থ মাওলানা আবু তাহেরের শয্যাপাশে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ মাওলানা আবু তাহেরকে হাসপাতালে দেখতে যান ফেডাশেনের নব-নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম শামসুল ইসলাম। তিনি অসুস্থ মাওলানার শয্যাপাশে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন এবং তার স্বাস্থ্যের খোজ খবর নেন। এ সময় ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের বিভাগীয় সভাপতি বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের বিভাগীয় সভাপতি বৈঠক রাজধানীর একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি গোলাম রব্বানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। এতে বিভাগীয় সভাপতিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মহান শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

ঢাকা মহানগরী উত্তর

গত ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি মহিবুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরীর উপদেষ্টা আব্দুর রহমান মূসা। এছাড়াও ফেডারেশনের মহানগরীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

গত ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা মাহবুবুর রহমান, শাহ আলম মিয়াজি, আব্দুল হালিম, মিনহাজ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

চট্টগ্রাম মহানগরী

গত ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর সদর অঞ্চলের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। ফেডারেশনের সদর অঞ্চল সভাপতি মকবুল আহমদ ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সদর অঞ্চলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হামিদুল ইসলাম, শহিদুল হাসান, সেলিম রেজা, মঈনুদ্দীন সোহেল, আব্দুল হামিদ প্রমূখ নেতৃবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর চান্দগাঁও থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের চান্দগাঁও থানা সভাপতি রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান।

রংপুর মহানগরী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট মোঃ কাওছার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সাতগরা থানা সভাপতি মোঃ আব্দুল বাতেন, তাজহাট থানা সভাপতি মোঃ মর্তুজার রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

নাটোর জেলা

গত ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নাটোর জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের নাটোর জেলা সভাপতি ড. জিয়াউল হক জিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মফিজ উদ্দিনের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক মোঃ সাদেকুর রহমান। অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আফতাব উদ্দিন, এ এস এম হবিবুর রহমান, মীর হাসেম আলী, শ্রমিক নেতা আব্দুল আজিজ লাবু, মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ মোল্লা, মুহাম্মদ আফজাল হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

গত ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নাটোর সদর উপজেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের নাটোর শহর সভাপতি এ এস এম হবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সদর উপজেলা সভাপতি মোঃ আফতাব উদ্দিনের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের নাটোর জেলা সভাপতি অধ্যাপক ড. জিয়াউল হক জিয়া। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন আব্দুল বাসেত, মোঃ দেলোয়ার হোসেন, মোঃ আশরাফুল ইসলাম, মোঃ আবু সাইদ, দিদার হোসেন, মোঃ আব্দুল করিম, নুর হোসেন প্রমূখ নেতৃবৃন্দ।

কুমিল্লা জেলা উত্তর

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা জেলা উত্তরের মুরাদনগর উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের উপজেলা সভাপতি আবু বকর ছিদ্দিক খানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সহ-সাধারণ সম্পাদক ও কুমিল্লা জেলা উত্তর সভাপতি অধ্যাপক মোঃ গিয়াস উদ্দিন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের উপজেলা প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মোঃ ইলিয়াস, জেলা পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সহ-সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন, মোঃ আবু হানিফ, মোঃ আবুল হোসেন, মোঃ শাহজাহান প্রমূখ নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান শেষে গরীব দুঃখী মানুষদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

মহানগরী/বিভাগীয় কার্যক্রম

সিলেট বিভাগের ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৩ জানুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট বিভাগের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট বিভাগের সভাপতি ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমেদের পরিচালনায় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন। এছাড়াও ফেডারেশনের মৌলভীবাজার জেলা সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সিলেট জেলা দক্ষিণের সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, সিলেট জেলা উত্তরের সভাপতি আনোয়ার হোসাইন, হবিগঞ্জ জেলা সভাপতি খলিলুর রহমান, সুনামগঞ্জ জেলা সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম তালুকদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

সিলেট মহানগরী
রেজিষ্ট্রার্ড ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৩ জানুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে রেজিষ্ট্রার্ড ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইয়াসীন আলীর পরিচালনায় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিল ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন। অন্যান্যদের মধ্যে মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক উবায়দুল হক শাহীন, মোঃ আব্বাছ আলী, বদরুজ্জামান ফয়সাল, আতিকুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট মহানগরী
ট্রেড ইউনিয়ন ও পেশাভিত্তিক ইউনিট সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন ও পেশাভিত্তিক ইউনিট সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট মহানগরী সভাপতি শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ইয়াছিন আলী খান এর পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। এ ছাড়াও ফেডারেশনের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এতে বক্তব্য রাখেন।

চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণ
উপজেলা সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের উদ্যোগে উপজেলা সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মুহাম্মদ ইছহাকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমানের পরিচালনায় উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম অঞ্চল দক্ষিণের পরিচালক কবির আহমদ। প্রধান অতিথি বলেন- সর্বস্তরে মাতৃভাষার ব্যাপক চর্চার মাধ্যমে ভাষা শহীদদের স্বপ্ন সফল করতে হবে। শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি ছাড়া এ জাতির ভাগ্য পরিবর্তন ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। নবী রাসূলদের দাওয়াতের প্রথম টার্গেট ছিলেন মেহনতি মানুষ। তাই শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি অহবান জানান।

চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণ
জেলা দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের উদ্যোগে জেলা দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মুহাম্মদ ইছহাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন বিভাগ দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক নেতা মশিউর রহমান, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি মাস্টার মনসুর আলী, উত্তর জেলা সভাপতি ইউসুফ বিন আবুবকর, কক্সবাজার জেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আলমগীর, রাঙামাটি জেলা সভাপতি এ বি এম তোফায়েল, খাগড়াছড়ি জেলা সভাপতি মো আব্দুল মান্নান প্রমুখ।

ঢাকা বিভাগ পশ্চিম
জেলা দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ১৭ জানুয়ারি সকাল ১১টায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের উদ্যোগে জেলা দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের বিভাগীয় সভাপতি আবুল বাশারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারন সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও ঢাকা অঞ্চল পশ্চিমের পরিচালক আযহারুল ইসলাম। উক্ত বৈঠকে ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সাধারণ সম্পাদকসহ জেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর মহানগরী
দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর মহানগরীর উদ্যোগে থানা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে শিক্ষা বৈঠক ও গন-সংযোগ পক্ষের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শিক্ষা বৈঠকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর মহানগর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি এ্যাডভোকেট মোঃ কাওছার আলী, দারসুল কুরআন পেশ করেন ফেডারেশনের মহানগরী উপদেষ্টা মওলানা মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিকী, প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন ফেডারেশনের মহানগরী সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোত্তালেব হোসেন।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা
সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার উদ্যোগে সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় একটি মিলনায়তনে ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মাষ্টার মনসুর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা প্রধান উপদেষ্টা জাফর সাদেক। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মোহাম্মদ ইছহাক। অন্যান্যদের মধ্যে বাঁশখালী উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা জহিরুল ইসলাম, মাওলানা নুরুল হোসাইন, মাওলানা মোঃ ইসমাইল, আরিফুর রশিদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লক্ষীপুর জেলা
দায়িত্বশীল সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষীপুর জেলার উদ্যোগে দায়িত্বশীল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটোয়ারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সাভাপতি ড. এ কে এম সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের লক্ষীপুর জেলার উপদেষ্টা এ আর হাফিজুল্লাহ ও অধ্যাপক আব্দুর রহমানসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ প্রমুখ।

রাজবাড়ী জেলা
নির্বাহী বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাজবাড়ী জেলার দায়িত্বশীল বৈঠক ও নির্বাহী পরিষদ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি মুন্সি সোলাইমানের সভাপতিত্বে ও জেলা সাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিনের পরিচালনায় উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মোঃ আজহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি কাজী অবুল বাশার, সহ-সভাপতি এস এম শাহাজাহান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

নীলফামারী জেলা
দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নীলফামারী জেলার উদ্যোগে উপজেলা দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের নীলফামারী জেলা সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান জুয়েলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারন সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের রংপুর বিভাগের সভাপতি মোঃ আবুল হাশেম বাদল। এছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম মহানগরী
বায়েজিদ থানার দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর বায়েজিদ থানার উদ্যোগে দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের থানা সভাপতি মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে উক্ত শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস.এম লুৎফর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের চান্দগাঁও থানা সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম। এছাড়াও মুসলিম উদ্দিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খাগড়াছড়ি জেলা
ইউনিট প্রতিনিধি কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খাগড়াছড়ি জেলার উদ্যোগে ইউনিট প্রতিনিধি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা সভাপতি মোঃ আব্দুল মান্নান ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ অলিউর রহমানের পরিচালনায় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মশিউর রহমান। এছাড়াও খাগড়াছড়ি পৌরসভা দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইমান হোসাইনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম মহানগরী
আন্দরকিল্লা ওয়ার্ড উত্তরের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর আন্দরকিল্লা ওয়ার্ড উত্তরের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের ওয়াড সভাপতি রেজাউল করিম মুরাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী উপদেষ্টা ফয়সাল মুহাম্মদ ইউনুছ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম সদর অঞ্চলের সভাপতি মকবুল আহমদ ভূঁইয়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হামিদুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম তুহিন, মোঃ রাশেদ সাইফুল্লাহ ও আবুল হাসেম আজাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

গাজীপুর মহানগরী
কাশিমপুর থানার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুর থানার উদ্যোগে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কাশিপুর থানা সভাপতি আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের গাজীপুর মহানগরী সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হাসান। এছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম মহানগরী
চকবাজার থানার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর চকবাজার থানার উদ্যোগে দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত। ফেডারেশনের থানা সাভাপতি এ.এ.এম শোয়াইবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস.এম লুৎফর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুন্নবী। এছাড়াও থানা সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণ
সদর উপজেলার শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম দক্ষিণের সদর উপজেলার শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাড. আশরাফুর রহমান ও আব্দুল আলিমের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সফরে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান, চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, উত্তর জেলা সভাপতি ইউসুফ বিন আবু বকর, উপদেষ্টা তৌহিদুল হক চৌধুরী, জসিম উদ্দিন আহমদ, মাওলানা নুরুল হুদা হামিদী, মেজবাহ উদ্দিন রাসেল, কুতুব উদ্দিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সোনাগাজী মুহুরী প্রজেক্ট এলাকায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা সফরে বিভিন্ন ইভেন্টের ক্রিড়া প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয় এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মরহুম মাওলানা আব্দুস সোবহানের রূহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

ঢাকা মহানগরী উত্তর

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের অন্যতম কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সাবেক এমপি মরহুম মাওলানা আব্দুস সোবহানের রূহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মোঃ মহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় উক্ত দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি আ.ন.ম শামসুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন-মাওলানা আব্দুস সোবহান শুধু ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অগ্রসেনানী ছিলেন না, তিনি ছিলেন ৫ বারের নির্বাচিত সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ও সমাজ সেবক। তিনি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে অনন্য অবদান রেখে গেছেন। পাবনার উন্নয়নে তিনি যে ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন তা পাবনাবাসীসহ দেশবাসী গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে, ইনশাআল্লাহ।

উক্ত দোয়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোহাম্মদ তসলিম ও মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য, পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক নুরুল আমিন, মহানগরী উত্তরের সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান পান্না, ইঞ্জিনিয়ার আতাহার আলী, সুলতান মাহমুদ, আব্দুল আলী বাসার প্রমূখ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে আরও বলেন- মাওলানা আব্দুস সোবহান ছিলেন মহান সংগঠক ও ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের একজন বুদ্ধিজীবী। তিনি ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শেষ বয়সে জেল-জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন এবং আমৃত্যু ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে, সারাজীবন যিনি দেশ ও জাতির কল্যাণে ভূমিকা পালন করলেন জীবনের শেষ মুহূর্তে তার সুচিকিৎসার কোন সুযোগ দেয়নি এ জালিম সরকার। তার সাথে যে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে তা নিতান্তই দুঃখজনক।

চট্টগ্রাম সদর অঞ্চল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম সদর অঞ্চলের উদ্যোগে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুস সোবহানের রূহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের সদর অঞ্চলের সভাপতি মকবুল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস. এম লুৎফর রহমান। এছাড়াও শ্রমিক নেতা হামিদুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রমিকসেবা

ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের মহনগরী সাধারণ সম্পাদক এইচ.এম আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও নুরুল আমিন এর পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মুহাম্মদ তসলিম। এছাড়াও ফেডারেশনের বিমানবন্দর থানার প্রধান উপদেষ্টা এডভোকেট ইব্রাহিম খলিল, বিমানবন্দর থানা সভাপতি ফজলুল হক, শ্রমিকনেতা নুরুল আমিন, সুজারুল হক সুজা, সালেহ আহমেদ, এনামুল হক শিপন, হামিদ হোসেন আজাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে রিকশা বিতরণ

গত ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে রিকশা বিতরণ করা হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোঃ আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ- সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালামসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

গাজীপুর মহানগরীর উদ্যোগে অসহায় দরিদ্র শ্রমিকদের মাঝে ভ্যান গাড়ি ও সেলাই মেশিন বিতরণ

গত ২৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের গাজীপুর মহানগরীর উদ্যোগে অসহায় দরিদ্র শ্রমিকদের মাঝে ভ্যান গাড়ি ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি মোঃ আজহারুল ইসলাম মোল্লার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম ভূঁইয়ার পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি হারুনুর রশিদ খান। এছাড়াও ফোডারেশনের মহানগরী অর্থ সম্পাদক গোলাম মাওলা সেলিম, দপ্তর সম্পাদক ও টংগী দক্ষিণ থানা সভাপতি নুরুজ্জামান ফকির, বাসন থানা ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রহমতুল্লাহ শিপনসহ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর মহানগরীর উদ্যোগে শীতার্ত গরীব শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ২৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর মহানগরী উদ্যোগে শীতার্ত গরীব শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ফেডারেশনের রংপুর মহানগরী সভাপতি এ্যাডভোকেট মোঃ কাওছার আলী। এতে হাজারীহাট থানা সভাপতি মোঃ সুলতান আহমেদসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর মহানগরীর উদ্যোগে নবজাতক শিশুদের জন্য উপহার সামগ্রী বিতরণ

গত ২৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর মহানগরীর উদ্যোগে নবজাতক শিশুদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মহানগর সভাপতি এ্যাডভোকেট মোঃ কাওছার আলী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল মহানগরীর উদ্যোগে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে রিকশা ও ভ্যান বিতরণ

গত ৩০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল মহানগরীর উদ্যোগে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে রিকশা ও ভ্যান বিতরণ করা হয়। মহানগরী সভাপতি এ্যাডভোকেট মুহাম্মদ শাহে আলমের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট মুয়াযযম হোসাইন হেলাল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডাশেনের বরিশাল বিভাগের সভাপতি মতিউর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বরিশাল মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ৩০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ শাহে আলমের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের বরিশাল বিভাগের সভাপতি মতিউর রহমান। এছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এসময় বরিশাল সদর সংবাদপত্র হকার্স ইউনিয়ন সদস্যদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর উদ্যোগে শীতার্ত অসহায় শ্রমিকদের মাঝে কম্বল বিতরণ

গত ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর উদ্যোগে শীতার্ত শ্রমিকদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি হাফেজ আব্দুল মোমিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান হোসেন মুন্নার পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবুল হাসেম। এছাড়াও মহানগরী সহ-সভাপতি মোশারফ হোসাইন, অর্থ সম্পাদক মুন্সি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ফাইসুলসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ রিকশা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ রিকশা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে গরিব ও অসহায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ রিকশা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক লস্কর মোঃ তসলিমের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হারুনুর রশিদ খান। অন্যান্যদের আরো উস্থিত ছিলেন মিজানুল হক, আব্দুল ওয়াদুদ সরকার, কবির আহমেদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

পল্লবীর বাউনিয়াবাঁধ বস্তিতে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ২৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে পল্লবী বাউনিয়াবাঁধ বস্তিতে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। খাদ্য সামগ্রী ও শীতবস্ত্র বিতরণের সময় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তছলিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান ও কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম। এছাড়াও শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ ইসমাইল, মোঃ আঃ মান্নানসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুরের শ্রীপুরে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে নগদ অর্থ ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর জেলার উদ্যোগে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায় অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে নগদ অর্থ ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন ফেডারেশনের গাজীপুর জেলা সভাপতি মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম ও জেলা উপদেষ্টা কালিয়াকৈর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ হারুন অর রশিদসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

চট্টগ্রাম মহানগরীর চান্দগাঁও থানার ফ্রি ম্যাডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন

গত ২৭ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর চান্দগাঁও থানার উদ্যোগে ফ্রি ম্যাডিকেল ক্যাম্প, হেলথ চেকআপ, ব্লাড গ্রুপিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। ফেডারেশনের থানা সভাপতি মুহাম্মদ রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস. এম লুৎফর রহমান। এছাড়াও ফেডারেশনের চকবাজার থানা সভাপতি ও মহানগরী সাংগঠনিক সম্পাদক এ. এ.এম শোয়াইব, সেলিম উদ্দিন, মুহাম্মদ ইছহাক, নুর উদ্দিন, অ্যাডভোকেট বাদশা, নাজিমুদ্দিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম মহানগরীর সদরঘাট থানার অসহায় শীতার্ত শ্রমিকদের মাঝে কম্বল বিতরণ

গত ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর সদরঘাট থানার উদ্যোগে অসহায় শীতার্ত শ্রমিকদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের সদরঘাট থানা সভাপতি রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এস. এম লুৎফর রহমান। এছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার শীতবস্ত্র ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

গত ২৭ ডিসেম্বর সেবাপক্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার উদ্যোগে দরিদ্র শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র ও তাদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের উপজেলা সভাপতি বেলাল আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মৌলভীবাজার জেলা সভাপতি সাইফুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে ফেডারেশনের উপজেলা উপদেষ্টা আঃ মুনতাজিমসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

গত ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার উদ্যোগে অসহায় শীতার্থ শ্রমিকদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের উপজেলা সভাপতি ডাঃ হেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সুনামগঞ্জ জেলা সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান দুলাল। এতে উপজেলা সাধারণ সম্পাদকসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দিনাজপুর জেলা উত্তরের বীরগঞ্জ উপজেলা পূর্বের শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ২৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন দিনাজপুর জেলা উত্তরের বীরগঞ্জ উপজেলা পূর্বের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। ফোডারেশনের উপজেলা সভাপতি ক্বারী আজিজুর রহমানের

সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের দিনাজপুর জেলা উত্তরের সভাপতি মোঃ জাকিরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা রাশেদুন্নবী বাবু। এছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নীলফামারী জেলা
জলঢাকা উপজেলার কম্বল বিতরণ

গত ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার উদ্যোগে দরিদ্র ও শীতার্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। জলঢাকার মীরগঞ্জ ইউনিয়নসহ বিভিন্ন স্থানে কম্বল বিতরণ কর্মসূরির উদ্বোধন করেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি প্রভাষক মনিরুজ্জামান জুয়েল। অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জলঢাকা উপজেলা উপদেষ্টা প্রভাষক মোঃ ছাদেক হোসেন, জলঢাকা উপজেলা সভাপতি প্রভাষক মুহাম্মদ মুজাহিদ হোসাইন, মীরগঞ্জ ইউনিয়ন উপদেষ্টা মোঃ আতিউর রহমান, মোঃ রেজাউল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ
ডেমরা জোনের শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের ডেমরা জোনের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এসময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান। এছাড়াও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ
দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগর দক্ষিণের দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। মহানগরী সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী দক্ষিণের প্রধান উপদেষ্টা ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ। এছাড়াও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা দোকান শ্রমিক কর্মচারী কল্যাণ
ইউনিয়নের শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

ঢাকা দোকান শ্রমিক কর্মচারী কল্যাণ ইউনিয়নের উদ্যোগে সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিক সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের উপদেষ্টা ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম। এছাড়াও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ফরিদপুর জেলা
ওয়ার্কশপ শ্রমিকদের মাঝে কম্বল বিতরণ

গত ২৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ফরিদপুর জেলার উদ্যোগে ওয়ার্কশপ শ্রমিকদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। কম্বল বিতরণ করেন ফেডারেশনের ফরিদপুর জেলা সভাপতি মাষ্টার জাহাঙ্গীর আলম। উক্ত অনুষ্ঠানে জেলা সাধারণ সম্পাদক শামীম আতাহারসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ জেলা
গার্মেন্টস বিভাগের টিফিন বক্স বিতরণ

গত ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ জেলার গার্মেন্টস বিভাগের উদ্যোগে ফ্যাক্টরী শ্রমিকদের মাঝে টিফিনবক্স বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ শিকদারের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাড. আলমগীর হোসাইন। অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আতাউর রহমান, ডাক্তার মানিক, ডাক্তার মিজানসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ট্রেডভিত্তিক কার্যক্রম

নাটোর জেলা
ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি নাটোর জেলার নলডাঙ্গা উপজেলার ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুরে এক শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ মামুনুর রশিদ মোল্লার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সফরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের নাটোর জেলা সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ জিয়াউল হক জিয়া। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ফেডারেশনের নাটোর জেলা সাধারণ সম্পাদক মফিজ উদ্দিন, শ্রমিক নেতা মোঃ শোয়াইব হোসেন, মোঃ জহুরুল ইসলাম, শাহ নেওয়াজ মামুন, বেলাল , নিজাম উদ্দিন, মানিক, আফতাব আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা সফরে নেতৃবৃন্দ টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুরে অবস্থিত ২০১ গম্বুজ মসজিদ ও নওয়াব মসজিদের স্থাপত্য কারুকার্য পরিদর্শন করেন।

কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়ন ঢাকা জেলা দক্ষিণ
উপজেলা সভাপতি বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়ন ঢাকা জেলা দক্ষিণের উপজেলা সভাপতি বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নের ঢাকা জেলা দক্ষিণের সভাপতি মাওলানা আশরাফ হোসেনের সভাপতিত্বে উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য এস এম শাহজাহান। উক্ত বৈঠকে কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের ঢাকা জেলা দক্ষিণের সকল উপজেলা সভাপতি উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম মহানগরী
হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট অঞ্চলের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট অঞ্চলের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত। ফেডারেশনের অঞ্চল সভাপতি মুহাম্মদ নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস.এম লুৎফর রহমান। এছাড়াও হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও ফেডারেশনের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আমিনজুট মিলস শ্রমিকদের
অনশন অনুষ্ঠানে সংহতি প্রকাশ

বকেয়া বেতন আদায় ও মজুরী কমিশন ঘোষনার দাবীতে আমিন জুট মিলস শ্রমিকদের অনশন অনুষ্ঠানে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস.এম লুৎফর রহমান।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের জেলা নির্বাহী সদস্যদের শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ.ন.ম শামসুল ইসলাম

বরিশাল বিভাগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

চট্টগাম মহানগরীর উদ্যোগে কেন্দ্র ঘোষিত গণসংযোগ পক্ষ (১-১৫ মার্চ-২০২০) উপলক্ষে শ্রমিকদের মাঝে পরিচিতি বিলি করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ.ন.ম শামসুল ইসলাম।

নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে অটোরিকশা বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

সিলেট মহানগরীর ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবসের আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম।

ইসলামী বইয়ের বিশাল সমাহার

৩০% কমিশনে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

ক্রম	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	ইসলাম ও শ্রমিক আন্দোলন	ড. জামাল আল বান্না	১০০/-
২	যিকির ও দোয়া	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৩	কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরক ও বেদায়াত	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৩০/-
৪	ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব ও ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৫	ইসলামী শ্রমনীতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৬	ইসলামী সমাজে শ্রমজীবি মানুষের মর্যাদা	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	২০/-
৭	ঐতিহাসিক ভাষন	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১০/-
৮	হাদীসের আলোকে মালিক-শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৯	শ্রমিক সমস্যার সমাধান	অধ্যাপক গোলাম আজম	১৫/-
১০	শ্রমিক আন্দোলন ও মাওলানা মওদুদী	সাইয়েদ মাওলানা মওদুদী	১৫/-
১১	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬	মো: আশরাফুল হক	১৩০/-
১২	ট্রেড ইউনিয়ন গাইড লাইন	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	৪০/-
১৩	ইসলামী শ্রমনীতির সুফল	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১৫/
১৪	ট্রেড ইউনিয়ন কাজের পদ্ধতি	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১০/-
১৫	তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইসলামী আন্দোলন	কবির আহমদ মজুমদার	২৫/-
১৬	শ্রম আইন ও শ্রমিক কল্যাণ	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/-
১৭	আল কুরআনের পাতায় শ্রম শ্রমিক শিল্প	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
১৮	মহিলা শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১২/-
১৯	শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২০	শিশু অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/
২১	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি ও কেন	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	৭/-
২২	Introduction to (BSKF)	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	২০/-
২৩	Islam & Rights of Labours	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২৪	ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	বেগম রোকেয়া আনছার	২২/-

কল্যাণ প্রকাশনী

৪৩৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
যোগাযোগ : ০১৮৭৬৯৯০১৮৬, ০১৯৯২৯৫১৩৬৪